Reg. No C. 534

২৬ বর্ষ। জ্যৈষ্ঠ। ২য় সংখ্যা।

ু-পত্রিকা।

WITH WHICH IS INCORPORATED "THE BRAHMACHARIN."

ধর্ম্ম-সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি-বিষয়ক
মাসিক-পত্রিকা।)

সম্পাদক
বেদান্তবাচস্পতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম, এ, বি, এল,
সহকারি-সম্পাদক
স্মৃতিসাংখ্যমীমাংসাতীর্থ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী।

যশোহর
হিন্দু-পত্রিকা-প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ইং—১১ই জুন ১৯১৯।
বাং—২৮শে, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬।
শকাব্দাঃ ১৮৩৯।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—সমেত ডাকমাশুল ২৲ মাত্র, এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা।

সূচী।

বর্ত্তমানসংখ্যার লেখকগণের নাম।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ, রায় শ্রীকালীচরণ সেন বাহাদুর বি, এল, শ্রী[illegible]চন্দ্র কাব্যতীর্থ, শ্রীমধুসূদন শাস্ত্রী, শ্রীপান্নালাল নন্দ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-বিশারদ, শ্রী——, শ্রীদুর্গাচরণ দাশগুপ্ত, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক প্রভৃতি।

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২৬ বর্ষ, ২৬শ খণ্ড ২য় সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ। | ১৩২৬ সাল। ১৮৪১ শকাব্দ।

বিদায়।

হে মোর স্বদেশ লহ নমস্কার—
জানিনা ও কোলে ফিরিব কি আর।
মধুর মথুরা পড়ে সদা মনে
প্রাণ কাঁদে এই দূর বৃন্দাবনে।
অলীক প্রয়াস ছলনা মিছার—
বৃথা ফেলা শুধু নয়ন আসার।
কেশী কংশ ভয়ে অবরুদ্ধ দ্বার—
হে মোর স্বদেশ লহ নমস্কার।

কোথা যৌবরাজ্য কোথা বনবাস
হে নিয়তি ? একি ভীম পরিহাস।
দূত এল বুঝি বিবাহ কারণ—
তা' না হয়ে হায়! হ'ল নির্ব্বাসন।
হেসে গেল সতী পতির ভবন
বিধির বিলাসে আগুনে মরণ।

তাবে এক নর হয় হায় আর
হে মোর স্বদেশ লহ নমস্কার।
হে স্বদেশ লহ প্রীতির প্রণাম
কর আশীর্ব্বাদে পূর্ণ মনস্কাম।
আমি চাহি সেই করুণার কণা
ফিরে যেই প্রেমে ভবে মৃত জনা।
একটুকু যার জ্যোতি অবশেষে—
নির্ব্বাসিত নল ফিরে এল দেশে।
সে করুণা যাচে তনয় তোমার—
হে মোর স্বদেশ লহ নমস্কার।

আজি চলে যেতে মুছি আঁখিজল
ফিরিতে যেন গো হাসি অবিরল।
চলে যেতে বাজে বুকে যেই ক্ষত—
প্রলেপ তাহাতে দিও অবিরত।
শান্তির হিল্লোলে বিনাশিয়া ব্যথা—
মুছ সেই দিন এ স্মৃতির কথা।
সেদিন ও কোলে ফিরিব আবার—
হে মোর স্বদেশ লহ নমস্কার॥

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।

পরকাল।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রাদ্ধে কতকগুলি মন্ত্রপাঠের ব্যবস্থা আছে। মন্ত্রগুলি শুদ্ধরূপে সংস্কৃত-ভাষায় যথাবিধি উচ্চারণ করা আবশ্যক। ভাষান্তর করিয়া মন্ত্র পাঠ করিলে মন্ত্রের শক্তি নষ্ট হয়, কিন্তু মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়া পাঠ করিলে আত্মশক্তির সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্র-শক্তির তেজ দ্বিগুণতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সত্য বটে মন্ত্র কতকগুলি শব্দবিন্যাস মাত্র, কিন্তু শব্দশক্তির অতুলনীয় প্রভাব।

পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, শব্দের স্পন্দন দ্বারা কাচের স্থূল জিনিষও ভগ্ন করা যায়। আর্য্যগণ মন্ত্রশক্তির প্রভাব ভুবর্লোকে প্রেরণ করার কৌশল অবগত ছিলেন; শ্রাদ্ধের মন্ত্র দ্বারা সূক্ষ্ম ভুবর্লোকে যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, তদ্বারা প্রেতশরীর স্পন্দিত হইয়া জীবকে শান্তিপ্রদ সূক্ষ্মদেহ ধারণের উপযুক্ততা প্রদান করে। অধ্যাত্মবিৎ শুদ্ধাচারী উত্তম ব্রাহ্মণের দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন না করাইলে আশানুরূপ ফল লাভ হয় না, কারণ ঐরূপ ব্রাহ্মণই শুদ্ধরূপে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রগুলিকে শক্তিমান্ করিয়া তুলিতে পারেন, এজন্য শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ নির্ব্বাচনের এত কঠোর বিধি।

শ্রাদ্ধাদিতে গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠের ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্রপাঠ দ্বারা প্রেতলোকে জীবের শুভ বাসনা উদ্দিপিত হইয়া থাকে; শুভ বাসনা জাগিয়া উঠিলে অশুভ বাসনা ক্ষয় হইয়া যায় এবং জীবের শুভ গতি লাভ হয়।

গীতামাহাত্ম্যে আছে—

পিতৃণুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতা পাঠং করোতিহি।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্ যান্তি স্বর্গতিম্॥
গীতা পাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রযান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদ তৎপরাঃ॥

আমাদের শুভ বাসনা দ্বারাও প্রেতদেহের উপকার সাধিত হইয়া থাকে; এজন্য মঙ্গল কামনা ও আশীর্ব্বাদ দ্বারা মৃত ব্যক্তির আত্মার সদগতির জন্য ভূরিভোজন ও দানের ব্যবস্থা আছে। যিনি যত উন্নত অবস্থার লোক হইবেন, তিনি তত মঙ্গল-কামনা সূক্ষ্মজগতে প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং তদ্বারা প্রেতশরীরের মন্দ কামনা-মূলক রাজস ও তামস উপাদানগুলি নষ্ট হইয়া জীবকে উত্তম সাত্ত্বিকদেহ ধারণ করাইয়া শান্তি ও সুখ প্রদান করে।

শ্রাদ্ধের দ্রব্যগুলিও শুদ্ধভাবে আহৃত হওয়া আবশ্যক। শ্রদ্ধা-ভক্তি-সহকারে শ্রাদ্ধীয় উপকরণ আহৃত না হইলে কোন ফল হয় না, এজন্য শাস্ত্র এই ক্রিয়ার নাম "শ্রাদ্ধ" দিয়াছেন। যাহা শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই শ্রাদ্ধ। মৃতের ইহলোকে যে সকল প্রিয় বস্তু ছিল, তাহা শ্রাদ্ধে দেওয়া আবশ্যক। ভক্তি-বিহীন হইয়া শ্রাদ্ধে কেবল বঞ্চনা-মূলক কার্য্য করিলে, তদ্বারা পিতৃলোকের উপকার হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। শ্রাদ্ধের জন্য অকর্ম্মণ্য নিকৃষ্ট দ্রব্যই লোকে প্রায়শঃ ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

মৃত্যুরপর সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত ১ বৎসরকাল মৃতের কল্যাণের নিমিত্ত ১৬টী শ্রাদ্ধ করিতে হয়। ইহার ফলে মৃত ব্যক্তি "প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে" প্রেতদেহ পরিত্যাগ করিয়া ভোগদেহ ধারণ করিয়া স্বীয় কর্ম্মানুসারে স্বর্গ কি নরকে গমন করে।

দ্বাদশাহে ততঃ কুর্য্যান্মাসে মাসে পৃথক্ পৃথক্।
এবং বিধি সমাযুক্তো প্রেত মোক্ষং করোতি হি॥

গরুড়পুরাণ উঃ খণ্ড ৩৯। ১৩

এক বৎসর যাবৎ মাসে মাসে পৃথক্ পৃথক্ এইরূপে অন্ন-জল দান করিতে হয়। এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে প্রেত মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রেতদেহ হইতে মুক্তি লাভ করে।

লোকের কর্ম্মানুসারে যে গতি লাভ হয় তাহা খণ্ডন করার কাহারও অধিকার নাই একথা আর্য্যগণ বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। শুভাশুভ কর্ম্মের ফল জীবকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং" ইহা তাঁহাদেরই কথা। ষোড়শ শ্রাদ্ধাদির দ্বারা জীব প্রেত-দেহ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ভোগদেহ ধারণপূর্ব্বক সত্বর কর্ম্মভোগ করিবার যোগ্যতা লাভ করে এবং বাৎসরিক শ্রাদ্ধাদির দ্বারা জীব যখন যে অবস্থায় থাকে তাহার অবস্থায় শান্তি লাভ ঘটে।

শ্রাদ্ধ পাঁচপ্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বৃদ্ধি ও পার্ব্বণ। প্রতিদিন যে শ্রাদ্ধ করা যায় তাহা নিত্য। বাৎসরিক শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক—ইহাকে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বলে; কারণ একজনের উদ্দেশ্যে এই শ্রাদ্ধ করিতে হয়। অভিপ্রেত সিদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ কাম্য। বিবাহ অন্নপ্রাশনাদি মাঙ্গলিক কার্য্যের পূর্ব্বে যে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। মহালয়া অমাবস্যা প্রভৃতি পর্ব্ব উপলক্ষে যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহা পার্ব্বণ।

সকল প্রকার শ্রাদ্ধেই দেহ ও মনকে সংযত রাখার জন্য কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন লঘু সাত্ত্বিক ও নিরামিষ আহার করা আবশ্যক। যাহাতে কোনরূপ চিত্তবিকার জন্মিতে পারে এরূপ কোন কার্য্য করিতে নাই। মিথ্যাকথন, ক্রোধ এবং অষ্টবিধ (১) মৈথুন

(১) স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং।
সংকল্প অধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তিরেবচ॥
এতন্মৈথুন মষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
অভ্যাসাৎ কুতকৈব ব্রহ্মচর্য্য বিরোধকং॥

পরিত্যাজ্য; মোট কথা সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মচারীর আচার গ্রহণ করিয়া দেহ ও মনকে এরূপভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যেন পরলোকে শক্তি সঞ্চালন করিবার ক্ষমতা জন্মে। এই সকল কার্য্যেও উপযুক্ত জ্ঞানী ব্রাহ্মণ চাই এবং শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যাদি যথাবিধি শ্রদ্ধাসহকারে সংগ্রহ করা আবশ্যক। শ্রাদ্ধ-কর্ত্তার মনে ভক্তি ও বিশ্বাস থাকা একান্ত প্রয়োজন। ভক্তি ও বিশ্বাস না থাকিলে শক্তিসঞ্চালনক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয় না এবং পিতৃগণকে শ্রাদ্ধে আবাহন করার শক্তি জন্মে না।

শ্রাদ্ধের সফলতা সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে, সেই জীব যদি কর্ম্মবশতঃ দেবতা হইয়া জন্ম লাভ করে, তবে শ্রাদ্ধান্ন অমৃতরূপে তাহার তৃপ্তিসাধন করে; গন্ধর্ব্ব জন্মে ভোগরূপে, পশু জন্মে তৃণরূপে ও মনুষ্য জন্মে অন্নপানাদিরূপে তৃপ্তিজনক হইয়া থাকে। জীবগণ যেখানেই থাকুক তাহারা যে জন্মে যে দ্রব্যভোজী হয় শ্রাদ্ধীয়ান্নও তদকারে তাহার নিকট উপস্থিত হয়। গাভী হারাইয়া গেলেও যেমন তদীয় বৎস তাহার মাতাকে চিনিয়া লইতে পারে তদ্রূপ অগ্নিস্বাত্তাদি পিতৃলোকস্থ সূক্ষ্ম দেহধারী দেবগণ সেই শ্রাদ্ধীয়ান্নকে এমনভাবে প্রেরণ করেন যে উহা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সন্নিধানে উপস্থিত হয়।

কিরূপে এই কার্য্য সাধিত হয়, তাহা আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা বুঝিবার উপায় নাই। সূক্ষ্মজগতের কথা সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা নাই; কাজেই এস্থলে শাস্ত্রই আমাদের অবলম্বন।

অপি যোনিশতং প্রাপ্তাং স্তাং স্তৃপ্তিরুপতিষ্ঠতি।
তেষাং লোকান্তরস্থানাং ত্রিবিধৈর্নাম গোত্রকৈঃ॥

গরুড়পুরাণ উঃ খণ্ড ১১অঃ ১৬

সন্তান যদি নাম গোত্রাদি উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করে তবে শতযোনি ভ্রমণকারী জীবেরও তৃপ্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত মন্ত্রে 'অগ্নিদগ্ধা'র একটী পিণ্ড দিতে হয়।

অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলেমম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাংগতিং॥
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্ন সিদ্ধার্ণ তথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্ত মেতৎ প্রয়ান্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ॥

যে সকল জীব অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে এবং আমার বংশে যাঁহাদের অগ্নিকার্য্য হয় নাই তাঁহারা ভূমিতে প্রদত্ত এই অন্ন দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিয়া সদ্গতি লাভ করুন। যে সকল জীবের মাতা, পিতা, বন্ধু কেহই নাই, অন্নসিদ্ধি নাই এবং অন্নও নাই, তাহাদিগের তৃপ্তির জন্য ভূমিতে অন্ন প্রদান করিলাম, তাহারা তৃপ্তি লাভ করিয়া সুখকর লোকে গমন করুক।

জীবের তৃপ্তি উৎপাদনপূর্ব্বক লোকান্তর প্রেরণ করা যে শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য, তাহা এই মন্ত্রে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এই মন্ত্রটী অতিসুন্দর; ইহা বিশ্বজনীন্ প্রেম ও করুণার আদর্শ।

শ্রাদ্ধ-শেষে পিতৃলোকের অশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করা হয় যথা:—

আশীষো মে প্রাণীয়ন্তাং পিতরঃ করুণাময়াঃ।
বেদাঃ সন্ততয়োনিত্যং বর্দ্ধন্তাং বান্ধবাঃ মম॥
দাতারো মে বিবর্দ্ধন্তাং বহুন্যন্নামি সন্তুমে।
যাচিতারঃ সদা সন্তু মাচ যাচামি কঞ্চন॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

করুণাময় পিতৃগণ আমাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন। আমার জ্ঞান, সন্তানগণ ও বান্ধবগণ নিয়ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। যাঁহারা আমাকে দান করেন তাঁহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন। আমার ভূরি পরিমাণে অন্নসংস্থান হউক; আমার নিকট সর্ব্বদা অনেকে যাচ্ঞা করুক, কিন্তু আমাকে যেন কাহারও নিকট যাচ্ঞা করিতে না হয়।

গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোকের উদ্ধার হয় এবং তাঁহাদের অক্ষয়-তৃপ্তি লাভ হয়, একথা সকল শাস্ত্রেই বর্ণিত আছে।

অত্র পিণ্ড প্রদানেন পিতৃণাং পরমাগতিঃ।
গয়া গমনমাত্রেণ পিতৃণামনৃণো ভবেৎ॥

গরুড় পূর্ব্বঃ ৮৩অঃ ৫।

যেষাং নিরয়মাপন্নাঃ পিতরো জন্ম জন্মণি।
তেষামুদ্ধরণার্থায় তীর্থ মেতৎ সুদুর্লভম্॥

স্কন্দপুরাণ আবন্ত্য খণ্ডে ৫৮অঃ ৩৮।

যাঁহাদের পিতৃগণ নিরয়গামী হইয়াছেন, তাহাদের নিরয়গামী পিতৃগণের উদ্ধারের নিমিত্ত এই সুদুর্লভগয়াতীর্থ।

উদ্বন্ধনমৃত যে চ বিষশস্ত্রমৃতাশ্চযে। ঐ ৪১।

যাহারা উদ্বন্ধন মৃত, বিষমৃত শস্ত্রমৃত তাহাদের উদ্ধারের জন্ম গয়া-শ্রাদ্ধ বিধেয়।

যাহারা প্রেতযোনি লাভ করিয়াছে—

"প্রেতযোনিং গতাশ্চৈব" (ঐ ৫৮)

তাহাদের উদ্ধারের জন্মও গয়া-শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। গয়ায় পিণ্ডদানের উপকারিতা সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোন মতভেদ নাই। গয়াশ্রাদ্ধ পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। যে সকল ব্যক্তি আত্মঘাতী ও মহাপাতকী, তাহাদের উদ্ধারের জন্ম গয়াশ্রাদ্ধ বিশেষ উপযোগী।

সাধক-প্রবর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে প্রশ্ন করায়, যাহাদের অপঘাত-মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহাদের সদ্গতি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন।

"শাস্ত্রে আছে, গয়াতে যথামত পিণ্ডদান ক'রলেই তাদের সদ্গতি হ'য়ে থাকে। ব্যবস্থামত দিলে, পরলোকগত আত্মা তা গ্রহণ করেন। আমি যখন গয়ায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কর্‌তে গিয়াছিলাম, তখন আকাশ গঙ্গা পাহাড়ে অনেক সময় থাক্‌তাম। ঐ সময়ে একবার একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘ'টেছিল। আমার একটা ব্রাহ্ম বন্ধু, বিলাত ফেরত ডাক্তার, সেই সময়ে গয়ায় গিয়ে-ছিলেন। তাঁর পরলোকগত পিতা তাকে একদিন স্বপ্নে বল্লেন "[illegible] যদি গয়ায় এসেছ, আমার একটা পিণ্ড দাও, আমি বড় কষ্ট [illegible] তিনি ব্রাহ্ম, ও সব কিছুই বিশ্বাস করেন না, তাই উড়িয়ে দিলেন [illegible] রাত্রিতে আবার স্বপ্নে দেখ্‌লেন, পিতা অত্যন্ত কাতরভাবে বল্‌ছেন '[illegible] তোমার কল্যাণ হবে, আমাকে এবার একটি পিণ্ড দিয়ে যাও।" দুবার স্বপ্ন দেখেও তিনি তা গ্রাহ্য কর্‌লেন না। আমাকে এ বিষয় এসে বল্‌লেন। আমি তাঁকে বল্‌লাম "পুনঃ পুনঃ যখন এরূপ দেখ্‌ছেন, তখন পিণ্ড দেওয়াই উচিত।" তিনি আমার উপর বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন, 'আপনি, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক হ'য়ে এরূপ কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন।' আমি তাঁকে বল্‌লাম 'আপনিতো আর আপনার বিশ্বাস মত দিবেন না, আপনার পিতার বিশ্বাস মত দিবেন, তাতে বাধা কি?' তিনি তাতে সম্মত হলেন না। পরে আর একদিন শুয়ে আছেন, সামান্য একটু তন্দ্রা এসেছে, দেখ্‌লেন, পিতা যোড়-হাত ক'রে বল্‌ছেন, 'বাপু আমাকে একটা পিণ্ড দিলে না?' বন্ধুটি [illegible] আমাকে এসে বল্লেন, 'মশায়, আজ আবার পিতাকে স্বপ্নে দেখ্‌লাম, [illegible] করযোড়ে কাতর হ'য়ে বল্‌ছেন, 'বাপু আমাকে একটি পিণ্ড দিলে না?

আমি বড়ই কষ্ট পেতেছি।' শুনে আমার কান্না পে'ল। আমি তখন বল্‌লাম 'আপনি নিজে না দেন, প্রতিনিধি দ্বারাওত দেওয়াইতে পারেন?' তিনি চুপ্ ক'রে রইলেন। আমি দুটি টাকা নিয়ে একটী পাণ্ডাকে ওঁর প্রতিনিধি হ'য়ে পিণ্ড দিতে ব্যবস্থা করে দিলাম। এই পিণ্ডদানের দিন বন্ধুটিকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে বিষ্ণুপাদপদ্মে উপস্থিত হ'লাম। প্রতিনিধি পাণ্ডা যখন পিণ্ড দান কর্‌লেন, তখন দেখ্‌লাম, বন্ধুটির চোখ্ দিয়ে দর্ দর্ ধারে জল প'ড়ছে। তিনি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে অস্থির হ'য়ে পড়্‌লেন। পরে জিজ্ঞাসা করায় বল্‌লেন, মশায়, যখন পিণ্ড দেওয়া হয়, তখন আমি পরিষ্কার দেখ্‌লাম, আমার পিতা খুব আগ্রহের সহিত দুই হাত পেতে পিণ্ড গ্রহণ করলেন, এবং হাত তুলে আমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লেন, 'বাপু, আমার যথার্থ উপকার কর্‌লে' তুমি সুখে থাক, ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন।' আহা, আগে যদি আমি জান্‌তাম, পিতা এভাবে এ'সে পিণ্ড গ্রহণ কর্‌বেন, তাহা হ'লে আমি নিজেই খুব যত্ন করে পিণ্ড দিতাম।' এ সকল ব্যাপার কি যুক্তি তর্কে বুঝান যায়?"

(শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু প্রসঙ্গ ১১১ পৃষ্ঠা)

তর্পণ।

তর্পণ পিতৃযজ্ঞের একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ। শ্রাদ্ধের ন্যায় ইহাও পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। শাস্ত্রানুসারে প্রতি দিন শুচি হইয়া সংযত চিত্তে পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য তিল মিশ্রিত জল প্রদান করিতে হয়। ইহাতেও মন্ত্র শক্তির সাহায্য নিতে হয়। নানা মত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পিতৃলোকের উদ্দেশে অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া জল উৎসর্গ করিতে হয়। এই কার্য্য দ্বারাও শ্রাদ্ধের ন্যায় পিতৃলোকের তৃপ্তি সম্পাদিত হইয়া থাকে ইহা শাস্ত্রের আদেশ। তৃপ ধাতুর অর্থ তৃপ্তি, পিতৃপুরুষদিগের প্রীতির নিমিত্ত জল দান করিতে ক্রিয়ার নামই তর্পণ। যাঁহারা প্রতি দিন তর্পণ করিতে অসমর্থ তাঁহারা প্রতি বৎসর অপর পক্ষে পনর দিন এই উদক ক্রিয়া করিয়া থাকেন। শারদীয় মহা পূজা যে শুক্ল পক্ষে অনুষ্ঠিত হয় তৎপূর্ব্বের কৃষ্ণ পক্ষের নাম অপর পক্ষ। সমস্ত পক্ষ তর্পণ করিয়া অমাবস্যার দিন মহালয়া পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। তর্পণ ক্রিয়া কেবল নিজ নিজ পিতৃপুরুষে নিবদ্ধ নহে। দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, অসুর, সর্প, পক্ষী, বিদ্যাধর, ব্যোমচর, জলচর, নিশাচর, পাপী, পুণ্যশীল প্রভৃতির জন্য অঞ্জলি পূর্ণ জল দিতে হয়। ব্রহ্মা অবধি নিকৃষ্ট প্রাণী পর্য্যন্ত সকলের তৃপ্তির কামনা আছে।

ধর্ম্মরাজ যমের উদ্দেশে তর্পণের বিধান আছে। মাঘমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমীতিথিতে 'ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ' প্রভৃতি মন্ত্র উদ্বোধন করিয়া মহাপ্রাণ চিরকুমার ভীষ্মের জন্যও তর্পণ করিতে হয়।

সমগ্র জগতের তৃপ্তির জন্য হিন্দুর প্রাণের ব্যাকুলতা। তর্পণের দ্বারা এই শুভসংকল্প হিন্দুর মনে প্রতিদিন উদিত হইয়া থাকে। আপন, পর—সকলের প্রতি হৃদয়ের সহানুভূতি বিস্তৃত করিবার এমন শ্রেষ্ঠ উপায় আর দ্বিতীয় নাই।

শ্রাদ্ধ-তর্পণ হিন্দুর পিতৃ-মাতৃ-ভক্তির জ্বলন্ত নিদর্শন। হিন্দু প্রত্যেক শুভ-কার্য্যে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ-তর্পণ দ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তি সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহা-দের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। নব শস্য গৃহে আসিলে তাহা পিতৃপূজায় নিয়োগ না করিয়া গ্রহণ করেন না। পিতৃলোকের পূজা করিলে—

আয়ুঃ, পুত্রান্ যশঃ স্বর্গং কীর্ত্তিং পুষ্টিং বলং শ্রিয়ং।
পশূন্ শৌর্য্যং ধনং ধান্যং প্রাপ্নুয়াৎ পিতৃপূজনাৎ॥
দেবকার্য্যাদপি সদা পিতৃকার্য্যং বিশিষ্যতে।
দেবতাভ্যঃ পিতৄণাং চ পূর্ব্বমাপ্যায়নং শুভম্॥

গরুড়পুরাণ উঃ খণ্ড

আয়ুঃ, পুত্র, যশ, স্বর্গ, কীর্ত্তি পুষ্টি বল স্ত্রী পশু ধন ধান্যাদি সর্ব্ব সুখ লাভ হয়। দেবকার্য্য অপেক্ষা পিতৃকার্য্য প্রশস্ত, এজন্য পিতৃগণের পূজাই অগ্রে করিবে।

বাস্তবিক শ্রাদ্ধ-তর্পণ বিশ্বপ্রেমের অন্যতম নিদর্শন। ইহা মানবের মনে মহাপ্রাণতা ও বিশ্বপ্রেম জাগাইয়া দেয়। বিশ্বপ্রেমই মানুষের চরম শিক্ষা,—ইহা আমাদিগকে প্রতিক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। দেশভেদে পর-লোক-গত আত্মার প্রতি ভক্তি-প্রদর্শনের বিভিন্ন ব্যবস্থা রহিয়াছে। আমরা আজ কাল তাহার অনুকরণে বার্ষিকসভা ইত্যাদি করিতেছি। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে ঋষি-প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহারা শ্রাদ্ধ ও তর্পণের যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করা সুবু-দ্ধির পরিচায়ক নহে।

এই স্থূলজগতেই এমন অসংখ্য বিষয় আছে, যাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমরা সূক্ষ্মজগতের কোন সংবাদ রাখি না; যাঁহারা সে জগতের সর্ব্বা অবগত ছিলেন, তাঁহাদের আদেশ আমাদের সর্ব্বথা পালনীয়। আমাদের

জ্ঞানের প্রসার অতি সঙ্কীর্ণ—ইহা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। দুই পাতা ইংরাজী পড়িয়াই যে আমরা বিশ্ব সংসারটা বুঝিয়াছি—ইহা আমাদের সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। শ্রাদ্ধতর্পণের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হয়, তাহাও আর্য্যগণ আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জ্ঞানের গভীরতা পরিমাপ করার সামর্থ্য আমাদের নাই। কাজেই অতীন্দ্রিয় বিষয়ে সূক্ষ্মদ্রষ্টা মাহাত্মগণের বাক্যই আমাদের অবলম্বনীয়।

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।

যে সকল বিষয় চিন্তার অতীত, তৎপ্রতি তর্কের যোজনা করিবে না। আর্য্যঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন যে, এই সমস্ত স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ এক অপূর্ব্ব সম্বন্ধে চক্রাকারে সম্বদ্ধ এবং আমাদিগকে তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। এই অপূর্ব্ব সম্বন্ধের কথা স্মরণ করিয়া শ্রীভগবান্ গীতায় প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ৩।১৭

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া এই সংসারে প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম চক্রের অনুবর্ত্তী না হয়—অর্থাৎ বিধি-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠান না করে, সেই ই[illegible] পাপ-পুরুষের জীবন বৃথা। ভগবান্ ঐ অধ্যায়ের একাদশ [illegible] সূক্ষ্মের সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন। পিতৃযজ্ঞ এই সম্বন্ধ-রক্ষার [illegible]য়। ইহাতে জীবের পরম কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। [illegible]ষিগণ তাঁহাদের অসীম জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিয়া গাহিয়াছিলেন—

পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

রায় শ্রীকালীচরণ সেন বাহাদুর বি, এল্।

সংস্কৃতসাহিত্যের বিকাশ।

আমরা কোনও ব্যক্তির পরিচয় দিতে হইলে তাহার বংশ-পরিচয়টা একবার আলোচনা করিয়া লই। আমাদের দেশের এই রীতি অনুসারে আজ সংস্কৃতসাহিত্যের বিকাশের কথা বলিবার পূর্ব্বে 'সাহিত্য' কথাটাকে

বুঝাইতে চেষ্টা করা উচিত। সাধারণতঃ আমরা "সাহিত্য" বলিতে যাহা বুঝি, সে একটা অভিনবতত্ব, শব্দসিন্ধুমথিত পীযূষ—সে এক ভগবদ্দত্ত অপূর্ব্ব সম্পৎ। আমরা মনে করি, সাহিত্য একমাত্র কবির কল্পনাজগতের অপূর্ব্ব সামগ্রী, সাধারণের কিছুই নহে, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায়, সাহিত্য পৃথক্ জিনিষ নহে। সে আমাদের প্রাণের সামগ্রী, জীবনের সহচর, ধর্ম্মের অভিব্যঞ্জক, কর্ম্মের সহায়, জ্ঞানের জন্মভূমি। বস্তুতঃ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাহার সঙ্গ লাভ করিয়া ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-পথের মধ্য দিয়া ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারি; যাহা আমাদের আত্মার সহিত অভিন্নভাব-সম্বন্ধে চিরজড়িত—তাহাই আমাদের হিন্দুর সাহিত্য। এই সাহিত্যের মূলে শব্দেরই অস্তিত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে, তাই শব্দময় বেদ দর্শন পুরাণ ইতিহাস কাব্য সমুদয় শাস্ত্র প্রাচীনকাল হইতে আমাদের প্রাণের সহিত, মনের সহিত, ধর্ম্মের সহিত, কর্ম্মের সহিত—এক কথায় সর্ব্বস্বের সহিত নৈসর্গিক্ সাহিত্যভাবে নিত্যসম্বন্ধ। সুতরাং আমরা একমাত্র কাব্যকেই সাহিত্য বলিতে পারিনা, বেদ পুরাণ ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান ও কাব্য সমুদয় শাস্ত্রই আমাদের সাহিত্য।

পূর্ব্বকালে "ভারতবর্ষ" নামের সহিত এদেশের কোন সম্বন্ধ ছিল না। তখন পৃথিবী সপ্তদ্বীপা—জম্বু, প্লক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর ও শাল্মলী এই সাতটি দ্বীপে বিভক্ত। পরে ঋষভরাজের রাজত্বকালে যখন তিনি তৎপুত্র ভরত রাজাকে জম্বুদ্বীপের অংশবিশেষ দান করিয়া বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন, সেইদিন হইতেই এদেশ "ভারতবর্ষ" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। তাহার কত শত শতাব্দী, কত যুগ-যুগান্তর পূর্ব্বে অমারজনীর প্রথম প্রভাতের আলোকরশ্মির মত, নববসন্তের প্রথম কোকিল-কূজনের মত, মন্দাকিনীর পবিত্র প্রথম জলধারার মত যখন আর্য্যগণ ভারতবর্ষে শুভ পদার্পণ করেন, সেইদিন—সেই প্রথম পদার্পণের শুভ মুহূর্ত্তে, তাঁহারা যে একটি অদৃষ্ট কল্পলতিকার অপূর্ব্ব অমৃতফল প্রাণের ভিতরে সযত্নে সুদূর দেশ হইতে আনিয়া ভারতবর্ষের পবিত্রক্ষেত্রে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাই—বেদ।

তৎকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যঋষিগণের ভিতরে এই বৈদিকভাষাই প্রচলিত ছিল। এই বৈদিকভাষাই তাঁহাদের পবিত্র ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ইহকাল ও পরকালের ভিতর থাকিয়া, তৎকালে একটি যুগ-ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহাই বৈদিক যুগধর্ম্ম। এই পবিত্র যুগে এক বেদের ভিতরেই তাৎকালিক

আর্য্যঋষিগণের উদার সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমি একটী কথা দ্বারা তাহার কিয়দংশ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

জগজ্জীবে সমপ্রাণতা দর্শন করিয়া আর্য্যঋষিগণ বলিয়াছেন :—

"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি"

"জগতের কোন প্রাণীকে হিংসা করিও না।" এ বিষয় একটু ভাবিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, বেদের এই নিষেধ বিধিটির ভিতরে আর্য্য-ঋষিগণের সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা, দুঃখে সমবেদনার গুপ্তভাব, বিশ্বপ্রেমিকতা ও সর্ব্বজীবে দয়াপ্রবণতার একটি পুণ্য শীত-সলিলস্রাবি প্রস্রবণ নিত্য উৎসারিত রহিয়াছে। তৎকালে ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যগণের এই মহানুভবতা ও বিশ্ব-প্রেমিকতা দর্শনে বন্যজন্তুগণও হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া পরস্পর সখ্যভাবে বিচরণ করিত। এইরূপে সাহিত্যের ভিতর দিয়া বৈদিকযুগের আর্য্যগণের চরিত্রা-লোচনা করিলে, তাহার ভিতরে আমরা এমন একটা গৌরবময় মহিমার উদ্দীপ্ততা অনুভব করি, যাহা সমস্ত বিশ্ব খুঁজিয়া আর কোথায়ও পাইনা।

একদিকে আর্য্য-চরিত্রের কোমলতা যেমন বিশ্ব ছাপিয়া উঠিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে আশ্রমপ্রাণীর উপরে স্নেহ-প্রবণতা তাঁহাদিগকে নিজের কর্ত্তব্যপথ হইতে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত করিতে পারে নাই। আমাকে বেদের ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে, আমি কর্ম্মের দাস, সুতরাং আমাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। এইরূপ কর্ত্তব্যের দৃঢ়ভাব তাঁহাদের চিত্তকে বর্ম্মের মত আবৃত করিয়া রাখিত। তাই তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত নিষেধবিধির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াও বিশেষ-বিধির অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন :—

"বায়ব্যং শ্বেতং আলভেতভূতিকামঃ" এইখানেই তাঁহাদের কোমল চিত্তের কঠোর পরীক্ষা। বস্তুতঃ সংসারে কর্ম্মের ভিতর থাকিলে যে চিত্তকে কোমল-কঠোরে গঠিত করিতে হয়, তাহা আমরা বৈদিকসাহিত্য হইতেই শিক্ষা করিতে পারি। সাহিত্য বৈদিক-যুগে এইরূপেই আর্য্যচরিত্রের উৎকর্ষ জ্ঞাপন করিয়াছে।

আর্য্যগণ ভারতে আসিয়া যেদিন পবিত্র বেদের ভিতরে ব্রহ্মের অমৃতাস্বাদ প্রাপ্ত হইলেন, যেদিন আর্য্যমানস-মন্দির ব্রহ্মের নির্গুণ নির্ব্বিকল্প প্রতিভা ফুটিয়া উঠিল; সেইদিন হইতেই তাঁহারা অখণ্ড বেদ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডের সৃষ্টি করিলেন। তাহারই জ্ঞানকাণ্ডের নাম উপনিষৎ। এই উপনিষদের ভিতরে আমরা বেদমাতা গায়ত্রীর প্রথম

বিকাশ দেখিতে পাই। বেদই সূর্য্যদেবকে জগৎসবিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার কারণ, আপনারা জানেন, পৃথিবীর উত্তরমেরুবাসিগণ ছয়মাস সূর্য্যদেবের আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। আদিত্যদেব অনবসরতা-প্রযুক্ত ছয়মাস আলোক দান করিয়াই মহাবিষুবরেখার অন্তরালে অন্তর্হিত হন। তাই ছয়মাস পরে যখন সুদীর্ঘ রজনীর প্রথম প্রভাতের আলোকজাল তাঁহাদের ঘরে অল্প ২ প্রবেশ করিয়া এক নৈসর্গিক অভিনব মধুরিমায় তাঁহাদের চিত্ত বিমোহিত করিয়া দেয়, যখন ভক্তিস্রোতে কৃতজ্ঞতার প্রবলপ্রবাহে হৃদয় ভরিয়া উঠে; তখন তাঁহারা যে সূর্য্যদেবকে জগৎস্রষ্টা সবিতা এবং ভূরাদি সপ্তলোকের প্রকাশক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? বাস্তবিক ছয়মাসের পর প্রথম জাগরণ একটা সৃষ্টিরই অনুকল্প। ইহাই কোনও ২ ঐতিহাসিকের মত। তাঁহারা বলেন— আর্য্যগণ উত্তরমেরু হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

এইরূপে বেদ জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডে বিভক্ত হইলে আর্য্যগণ নিজের দেশের ভিতরে যখন মহাভূতের একটা বিরাট সম্বন্ধ ও প্রাধান্য অনুভব করিলেন, সেইদিন হইতেই আমাদের বৈদিকযুগে কর্ম্মকাণ্ডাধিকারীর হস্তে যজ্ঞের সৃষ্টি হইল। তখন "কর্ম্ম" বলিলে একমাত্র "যজ্ঞ"কেই বুঝাইত। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত জ্যোতিষ ও ছন্দঃ এই ষড়্বিধ বেদাঙ্গের সাহায্যে আমরা বেদের মর্ম্মানুভব করিয়া থাকি। শিক্ষাশাস্ত্র হইতে লেখ্যভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে আর্য্যগণ বিরাট বেদ মুখে মুখেই অভ্যাস করিতেন। তাঁহাদেরই অভ্যস্ত বেদবাণী আমরা বর্ত্তমান-যুগে শ্রুতি ও স্মৃতিরূপে পাইয়া থাকি। আমি যখনকার কথা বলিতেছি, তখন বেদের সামাদি-বিভাগ হয় নাই। এই বৈদিকযুগের বহুবর্ষ পরে ব্যাসদেব বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া মহর্ষি পৈলকে ঋগ্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ এবং সুমন্তকে অথর্ব্ববেদ শ্রবণ করাইতে নিযুক্ত করেন। ইহারাই মন্ত্র, নামধেয়, নিষেধ, অর্থবাদ প্রভৃতি দ্বারা বিভক্ত বেদকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উপরোক্ত চারিবেদের ভিতর ঋগ্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। আর্য্যগণের ভিতরে ইহাই সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত ছিল।

তৎপরে ক্রমশঃ বর্ণ-বিভাগের পর চতুর্ব্বেদ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির রাজ্য-বিস্তৃতির সঙ্গে—একটা জাতীয় মহাশক্তির অমিতপ্রভাবে প্রতি হৃদয়ে অনুপ্রাণিত হইয়া যখন স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিয়াছে, যখন আর্য্যজাতি

এক বেদ ভিন্ন অন্য জ্ঞাতব্য কোন বিষয় ছিলনা, এক বৈদিক কর্ম্ম ভিন্ন যখন তাঁহারা অন্য কর্ম্মে আসক্ত ছিলেন না, যখন আর্য্যগণের ভিতরে সামাজিকতার তেমন করিয়া প্রসার হয় নাই, সেই সময় সহসা একদিন বাল্মীকির পবিত্র ঋষিকণ্ঠে কোন অদৃশ্য দেবতার আশীষবাণীর মত "মা নিষাদ"—স্বর উচ্চারিত হইল। সে অভিনব বাণীর অপূর্ব্ব জ্যোতিঃপ্রবাহে তাঁহার হৃদয় কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিল। সেই ঋষিকণ্ঠ-নিঃসৃত দিব্যবাণী ক্রৌঞ্চবধ-রত নিষাদের পক্ষে অভিশাপ-বাণী হইলেও আমাদের সাহিত্যবিশ্বে তাহা আশীর্ব্বাদরূপেই বর্ষিত হইয়াছিল। সেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে পবিত্র তমসা-নদী-তীরে বাল্মীকির পূত-কণ্ঠ-গর্ভে আমাদের বঙ্গবাণীর স্নেহময়ী অমৃত নিস্যন্দী ভাবাজননী জন্মগ্রহণ করিলেন। ঋষিবর সেই দিন এই সদ্যঃপ্রসূত ভাষাকে লইয়া ভক্তিশীতল রামায়ণের অমৃত অঙ্কে রাখিয়া পালন করিতে লাগিলেন। তাই রামায়ণ আমাদের ভাষাজননীর বাল্যলীলা; মহর্ষি বাল্মীকি আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যের আদি কবি। এই রামায়ণের ভিতরে আমরা একাধারে পুরাণ, ইতিহাস ও কাব্যের ভাবী প্রতিভার একটি অস্ফুট বিকাশ দেখিতে পাই। রামায়ণ সঙ্গীত, ইহা শুধু বাল্মীকির লিখিত "গ্রন্থ" নহে। তখন লেখ্য ভাষায় প্রচলন ছিল না, তাই শ্রীরামচন্দ্রের সভায় উহা গান-রূপেই গৃহীত হইয়াছিল।

"চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্রপদমর্থবৎ।
চতুর্বিংশৎ সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবান্ ঋষিঃ।
তথ সর্গশতান্ পঞ্চ ষট্‌কাণ্ডানি তথোত্তরং।"

(রামায়ণ)

রামায়ণের এই উদ্ধৃত শ্লোকে "চকার"পদ দ্বারা গ্রন্থে বাল্মীকির তপোময় উৎসাহময় যত্ন এবং "উক্তবান্" পদে রামায়ণ যে তাঁহার মানসকাব্য, ইহাই প্রতিপাদিত হয়। যাহা সুন্দর, তাহা যেমন সৌন্দর্য্য হইতে উদ্ভূত হইয়া বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য্যেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি সংস্কৃত সাহিত্য কুশীলবের বালকণ্ঠ-নিঃসৃত রামায়ণের মধুর সঙ্গীত হইতে প্রথম বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া জয়দেবের মধুর প্রেম-সঙ্গীতেই শেষ প্রতিভা বিকাশ করিয়াছে। যাহার সঙ্গীতেই উদ্ভব, তাহার সঙ্গীতেই বিশ্রাম উপযুক্ত।

শ্রীঅভিলাষচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

সহধর্ম্মিণী।

"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ"

সংসার যবে সম্মুখে আসে নব পরিচয় গাঁথিয়া,—
রঙিলতা যত অন্তর্হিত কর্ম্মের কশা লাগিয়া।
কোথায় সুদূরে স্নেহের বাঁধন
কর্ত্তব্য যে কঠোর ভীষণ—
চোখের সমুখে সদা ভেসে আসে নিরাশার শত বাণী গো—
অন্তর মাঝে কুটিলতা সাজে বলে কে সতত জানি গো ?
"জানি গো জগতে কে বল কাহার,
ধরম করম মিছা শুধু আর,
রয়েছে শঠতা নীচতা দীনতা হীনতা-পূরিত সকলি,
ধর্ম্মের ভান নেশার মতন চঞ্চল করে কেবলি।"
এইমত যদি চিন্তার নদী
উথলিত প্রাণ করে নিরবধি,
তখন কাহার ব্রত পূজা মাঝে হেরি মঙ্গল সরণী—
গৃহিণীর সাজে মঙ্গলময়ী সে যে গো বঙ্গরমণী॥

অভাব-পবন বহে অবিরত ঝঞ্চার মত জীবনে
সংসার যবে স্বচ্ছল নহে অভাবের শত তাড়নে—
অর্থের রাশি নিয়াছে বিদায়
সদা কাণে যায় নাই-নাই, হায়!
জীবন যখন চিন্তার শত বৃশ্চিক-জ্বালা সহে গো!
মনোমাঝে হয় যৌবনের এ নন্দন বুঝি নহে গো!
তখন কাহার নিরলস পাণি
সন্তোষ সুখ নিছনিয়া আনি'
দুঃখের মাঝে তৃপ্তি-অশথ প্রতিষ্ঠা করে হাসিয়া,—
একের জীবনে অপর জীবন যায় বুঝি সদা ভাসিয়া।
তৃণ গাছটীও লোকসান্ নাহি
যায় কদাচন কার মুখ চাহি'
"চিরদিন কভু সমান না যায়" আশার ঝিলিকে অমনি—
মন্ত্রীর মত প্রাণে আনে প্রাণ সে যে গো বঙ্গরমণী॥

শ্রান্তির ঘন অবসাদ যবে চেপে আসে বুক ভরিয়া ;
ভগ্ন হৃদয়ে নগ্ন-সোহাগে মগ্ন আবেশ ধরিয়া,
ক্লান্তি তখন আসি দেয় দেখা
অশান্তিময় ললাটের লেখা
পুঞ্জিত করি দগ্ধ হাসির উপহাসমালা গাঁথিয়া,
বক্ষের মাঝে বেদনার সাজে দাঁড়ায় থমকে আসিয়া।
তখন সারাটী অন্তর ভরি'
ব্যথিত বেদন বিদূরিত করি'
মঙ্গলময়ী বাণীটী কাহার ভরসার আলো আনে গো !
কোথায় আমার গভীর বেদন ইঙ্গিতে সে যে জানে গো !
ব্যথিত অঙ্গে প্রলেপ হানিয়া
শুশ্রূষা যার ভ্রমিছে ভাসিয়া
সুখে কি দুঃখে কে ওই পার্শ্বে দাঁড়ায়ে যখনি তখনি,
সখীর সমান ঢেকে আছে চির সে যে গো বঙ্গ রমণী॥
যখন বিষাদ আকাশপাতাল ভাঙ্গিয়া আসে গো সঘনে,
তখন কাহার হাসি-রামধনু শোভা পায় হৃদি-গগনে ?
দুঃখের বাণী উধাও করিয়া
সুখের কাহিনী সাদরে বরিয়া
প্রাণের দুয়ারে উঁকি দেয় আসি বিজলী বিকাশ চমকি'
ছন্দ -মধুর স্তোত্র-নিকর ভাবের গমকে থমকি'।
প্রাণের বেদন করিয়া হরণ
ঢালে তার মাঝে সুখ-রসায়ন
স্বর্গের ছবি পুলকাহ্বানে মর্ত্তে আনিছে টানিয়া ;
প্রভায় তাহার নরকের দ্বার অদূরে যেতেছে সরিয়া।
মর্ত্তে সে যে গো নন্দনবন
হৃদয় স্নেহের সে প্রস্রবণ
উন্মুখ হয়ে ঢালি' স্নেহবারি পূর্ণ করিছে অবনী—
ললিতকলার প্রেয়সী শিষ্যা সে যে গো বঙ্গরমণী॥

শ্রীচৈতন্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।

শিক্ষাষ্টকম্ ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

এক্ষণ আমার মনের যাহা অভিলাষ, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, শ্রাবণ করুন। যদিও আমি নিত্য দাস এবং আমার বেতনাদি নাই, তথাপি ভরণ-পোষণার্থ যাহা কিছু প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা এইরূপেই পাইবার প্রার্থনা—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬

তোমার নাম করিতে করিতে নয়ন গলদশ্রুধারায় পরিব্যাপ্ত হইবে, গদ্গদ বাক্যে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইবে, সর্ব্বদেহব্যাপি লোমকূপসকল পুলকান্বিত হইবে ও আমি উচ্চৈঃস্বরে "হে হরে!" "হে কৃষ্ণ!" "রক্ষ মাং", "রক্ষ মাং" বলিয়া কীর্ত্তন করিব।

শ্রীকৃষ্ণের নামে যে হৃদয় দ্রবীভূত হয় না, তাহা পাষাণসদৃশ যথা—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥

শ্রীভাগবতে ২।৩।২৪।

হরিনাম গ্রহণ করিলে যে হৃদয়ে বিকার না জন্মে এবং যাহার নেত্রে জল ও গাত্ররোমে পুলক না হয়, তাহা প্রস্তরতুল্য কঠিন।

পুনরায় কহিয়াছেন—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম-কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥

শ্রীভাগবতে ১১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৪০।

কবি যোগেন্দ্র, জনক মহারাজকে কহিয়াছিলেন যে, এই প্রকার ভক্ত্যঙ্গ-যাজী পুরুষ স্বীয় প্রিয়তম হরির নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে জাতানুরাগ ও বিবশহৃদয় হওয়াতে উন্মত্তের ন্যায় কখনও উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চীৎকার, কখনও গান এবং কখনও বা নৃত্য করিয়া থাকেন। [পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই সকল কার্য্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—তিনি হাস্য করেন কেন? উত্তর—"ভগবান্ ভক্ত কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন" এই মনে করিয়া হাস্য করেন। তিনি রোদন করেন কেন? উত্তর—"হা প্রভু! তুমি আমাকে এতদিন উপেক্ষা করিয়াছিলে"—এই মনে করিয়া রোদন করেন। তিনি চীৎকার করেন কেন? উত্তর—"হে প্রভু! তুমি কোথায় আছ, একবার দেখা দাও" বলিয়া চীৎকার করেন। তিনি গান করেন কেন? উত্তর—"হে হরে! আমায় অনুগ্রহ কর" বলিয়া অতি আনন্দে গান করেন। তিনি নৃত্য করেন কেন? উত্তর—"হে কৃষ্ণ! তুমি আমার নিকট পরাজিত হইলে,—পরাজিত হইলে" বলিয়া নৃত্য করিয়া থাকেন।] এই প্রার্থনায় সাধকের শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমরূপ পঞ্চম-পুরুষার্থ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে—

কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণমাধুর্য্য রস করায় আস্বাদন॥

শ্রীচরিতামৃতে আদি-লীলায়াং ৭ পরিচ্ছেদে।

এক্ষণে সাধকের সিদ্ধাবস্থা-প্রাপ্ত্যনন্তর যে তদ্ভাবভাবিতাত্মতা হয় সেই ভাবান্বিত হইয়া অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাবে আত্মমন বিভাবিত করিয়া কৃষ্ণ-বিরহে অবিসহ্য যাতনায় বলিতেছেন—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেন মে ॥ ৭ ॥

হে গোবিন্দ! আমি কি প্রকারে তোমার বিরহে কালযাপন করিতেছি, তুমি তাহা অনুভব করিতে পারিতেছ না; যদি পারিতে, তাহা হইলে আমাকে দর্শন না দিয়া থাকিতে পারিতে না। আমি তোমার বিরহে নিমেষ-কালকে যুগ জ্ঞান করিতেছি। প্রিয় ব্যক্তির অদর্শনে ত্রুটি-পরিমিত কালও যুগ বলিয়া জ্ঞান হয় যথা—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটি র্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।

কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চতে
জড়উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥

শ্রীদশমে ৩১। ১৫।

গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন যে, তুমি যখন দিবাভাগে কাননে ভ্রমণ কর, সে সময়ে তোমার বক্রকুন্তল ও মনোহর মুখ দর্শন না করায়, আমাদের নিমেষকালও যুগবৎ বলিয়া অনুমান হয়। আবার দিনান্তে যখন তুমি কানন হইতে প্রত্যাগত হও, তখন তোমার সুন্দর মুখ অবলোকন করিয়া নিমেষ মাত্র ব্যবধানও অসহ্য হওয়াতে দর্শন-সাধন নেত্রের পক্ষ্মকারী ব্রহ্মাকে মূর্খ বলিয়া মনে হয়।

অন্যত্র—

তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা
ময়ৈব বৃন্দাবন-গোচরেণ।
ক্ষণার্দ্ধবত্তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং
হীনা ময়া কল্পসমাঃ বভূবুঃ ॥

শ্রীভাগবতে ১১। ১২। ১১

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে করিয়াছিলেন যে, গোপাঙ্গনাগণের আমি প্রিয়তম ছিলাম। যখন আমি বৃন্দাবনে ছিলাম, তখন আমার সহিত যে সকল রাত্রি তাঁহাদের ক্ষণার্দ্ধের ন্যায় অতিবাহিত হইয়াছিল, আমা হইতে পৃথক্ থাকিলে সেই সকল রাত্রিই তাঁহাদের কল্পের সমান বোধ হইয়াছিল।

কেহ যদি বলেন যে, এইক্ষণই কৃষ্ণ পাইবে—চিন্তা কি? এই বাক্যেই আশা হইল যে, মুহূর্তমধ্যেই কৃষ্ণ দর্শন পাইব; কিন্তু এই মুহূর্তকাল যদি কৃষ্ণবিয়োগে জীবন থাকে, তাহা হইলেই ত কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইতে পারিব, এরূপ ধারণা কেন হয় না? কারণ কৃষ্ণবিয়োগ জন্য যে যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা মৃত্যু-যন্ত্রণা হইতেও গুরুতরা।

দুঃখ মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত-(১) বিরহ বিনা দুঃখ নাহি আর।

শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায়ং ৮ পরিচ্ছেদে।

---

(১) ভক্ত এবং ভগবানের পার্থক্য নাই—বরং ভগবান্ আপন অপেক্ষা ভক্তের প্রাধান্য অধিক করিয়াছেন যথা—
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা— শ্রীভাগবতে ১১। ১৯। ২১।

অন্যত্র—

ভগবান্। কিং দুঃখং ?

রামানন্দঃ। ভগবৎ প্রিয়স্য বিরহো নোহন্যদ্‌ব্রণাদিব্যথা ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৭ম অঙ্কে।

এ বিষয়ে পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও কহিয়াছেন—

"কোটিব্রহ্মাণ্ডগতং সমস্ত সুখং যস্য সুখস্য লেশোঽপি ন ভবতি
সমস্তবৃশ্চিকসর্পাদি-দংশ-কৃতদুঃখমপি যস্য দুঃখস্য লেশোঽপি ন ভবতি
এবম্ভূতে কৃষ্ণ-সংযোগবিয়োগয়োঃ সুখদুঃখে যতো ভবতঃ ॥"

উজ্জ্বল-নীলমণি-কিরণে—

শ্রীকৃষ্ণ নিকটে থাকিলে তাঁহার দর্শনজনিত-সুখ ও কোটিব্রহ্মাণ্ডগত সমস্ত সুখও তুল্য হইতে পারেনা, এবং তাঁহার অদর্শনে তাঁহার অদর্শন-জন্য দুঃখ ও সর্পবৃশ্চিকাদিদংশন-জন্য দুঃখও তুল্য হইতে পারেনা,—এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-সংযোগজসুখ এবং কৃষ্ণবিয়োগজনিত দুঃখ হইয়া থাকে।

পুনরায় অন্যত্র কহিয়াছেন—

ঔর্ব্ব-স্তোমাৎ কটুরপি কথং দুর্ব্বলেনোরসা মে
তাপঃ প্রৌঢ়ো হরিবিরহজঃ সহ্যতে তন্ন জানে।
নিষ্ক্রান্তশ্চেদ্ভবতি হৃদয়াদ্ যস্য ধূমচ্ছটাপি
ব্রহ্মাণ্ডানাং সখি কুলমপি জ্বালয়া জাজ্বলীতি ॥

উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাবপ্রকরণে ১৩৫ অঙ্কে।

শ্রীমতী কহিয়াছিলেন যে, হে সখি! শ্রীকৃষ্ণের বিরহানল বাড়বানল হইতেও কটু; সে যন্ত্রণা যে কিরূপে সহ্য করিতেছি, তাহা জানি না। যদি ঐ তাপের ধূমচ্ছটাও আমার হৃদয় হইতে বহির্গত হয়, তাহা হইলে বোধ হয় ব্রহ্মাণ্ড-সমুদায় সে জ্বালাতে জ্বলিয়া যাইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

"আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ" "শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলায়াং ৬ পরিচ্ছেদে।

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥

শ্রীভাগবতে ১১।১৪।১৪

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন যে ব্রহ্মা আমার পুত্র হইয়াও শঙ্কর স্বরূপভূত হইয়াও সঙ্কর্ষণ ভ্রাতা হইয়াও এবং লক্ষ্মী ভার্য্যা হইয়াও আমার প্রিয় নহেন এবং আমার আত্মাও তাদৃশ প্রিয় নহে, যেমন তুমি আমার প্রিয়।

কর্ম্ম-ধর্ম্ম ও ভক্তি।

এ জগতে কতকগুলি বাহিরের বিষয় আছে, যাহা "ধর্ম্ম"-শব্দে আখ্যাত হইয়া থাকে। জগতের সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই এইরূপ কতকগুলি বাহ্যক্রিয়াকে সত্যধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন ও আচরণ করেন। মানবের অন্তরাকাশে ধর্ম্মভাব উদিত হইলে, তাহা কতকগুলি বাহ্যক্রিয়াতে আত্ম-প্রকাশ করে, ইহা নিশ্চিত ও স্বভাবসিদ্ধ। এইরূপে প্রাচীনকালে মানবের যখন "আত্মার অমরত্ব"-সত্যে বিশ্বাস আসিল, তখন মৃত ব্যক্তির শবদেহের সহিত তাহার জীবিতাবস্থায় ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্র ও পরিচ্ছদাদি চিতানলে পোড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিল। সকলদেশে সকল জাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়—মানব-হৃদয়ের ধর্ম্মভাব কতকগুলি ক্রিয়ার আকার ধারণ করে। ধর্ম্মভাবের স্বাভাবিক বাহ্য-অভিব্যক্তিই পরবর্ত্তিকালে শাস্ত্ররূপে মানবজাতিকে শাসন করে। জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, যখনই মানবের অন্তরে কোন নূতন সত্য বা ভাবের বিকাশ হয়, তখনই তাহা স্বভাবতঃ দ্বিবিধ আকারে প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ তাহা কতকগুলি নিত্য আচরিত বাহিরের ক্রিয়াতে প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়তঃ সেই সমস্ত নূতন সত্য ও ক্রিয়াপরম্পরা লইয়া সমভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে একটি সম্প্রদায় গঠিত হয়। এই সকল ক্রিয়া ও সম্প্রদায় সেই সেই সত্য ও ভাবের বাহিরাবরণ বা আধার-স্বরূপ। যেমন একটি বৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বে কঠিন আবরণের মধ্যে অবস্থিত থাকে এবং তাহার মধ্যে বায়ু ও উত্তাপ হইতে নিরাপদে রক্ষিত হইয়া নিজ শক্তির বিকাশ করিতে থাকে, সেইরূপ ভগবান্ মানবের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সত্য ও ভাব সকলকে উপর্য্যুক্ত ক্রিয়া ও মণ্ডলীরূপ আবরণের মধ্যে রক্ষা করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করেন। প্রত্যেক সমাজের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা সকল তত্তৎসমাজস্থ নরনারী-দিগের শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ সাহায্য করে। মানব-সমাজের মধ্যে যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে, উহা দ্বারা মানব শিশুপালন, দাম্পত্যপ্রেম ও গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা অন্য কোন প্রকারে পাইতে পারেনা। এই সকল সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিধি-ব্যবস্থা মানবের দৈনিকজীবনের প্রত্যেক কার্য্যে প্রবেশলাভ করিয়া, তাহার চিন্তা, সামাজিক

প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মভাবকে গঠন করে। এইরূপে হিন্দুবালক-বালিকাগণের অন্তরে ধর্ম্মের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকল নীরবে প্রবিষ্ট হইয়া যেরূপ বদ্ধমূল হয়, সেরূপ অন্যত্র দেখা যায় না। অতএব উক্ত ধর্ম্মক্রিয়া-সকলকে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না। কিন্তু এ বিষয়ে একটি বিপদ্ আছে, তৎসম্বন্ধে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। মানব অনেকসময় বাহিরের এই ক্রিয়াসকলকে ঈশ্বরলাভের উপায়-স্বরূপ না ভাবিয়া ভ্রমবশতঃ লক্ষ্যস্বরূপ মনে করিয়া থাকে। তখন মানব, ভক্তি-সাধন-রূপ ঈশ্বরলাভের একমাত্র সারপথ পরিত্যাগ করিয়া কতকগুলি প্রাণহীন আচরণকেই "ধর্ম্ম" বলিয়া মনে করে। সংসারে এমন অনেক মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা শাস্ত্রের বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বনপূর্ব্বক দৈনিকজীবনের কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, অথচ তাঁহাদের মন সর্ব্বদা সংসারের ক্ষুদ্র-স্বার্থলাভের চিন্তায় নিরত। পরস্বাপহরণে, মিথ্যাকথনে, সতীর সতীত্বনাশে, এমন কি সুবিধা পাইলে দরিদ্রের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না। যে মহাত্মগণ প্রথমতঃ এই সব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মহৎ উদ্দেশ্য এই ছিল যে, সর্ব্বদা এই সব কার্য্য দ্বারা সাধক ভগবানের স্বরূপে মনঃ-সংযোগপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া সাধনের সারবস্তু ভক্তিরত্ন অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, উক্ত নাম-জপ প্রভৃতি অনুষ্ঠান কোন কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে যে "বাহিরের ব্যাপার" হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বৌদ্ধদিগের নাম-জপের কল প্রস্তুতের বিষয় চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ধর্ম্ম-সাধন বা ভগবানের করুণা-লাভের নিমিত্ত প্রতিনিধি-নিয়োগও বৌদ্ধদের কলে নামজপ-করণের সদৃশ প্রণালী—বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখন জানা গেল যে, ধর্ম্মসাধন কেবল একটা বাহিরের ব্যাপার নহে এবং কতকগুলি দৈনিক বাহ্যক্রিয়ার আচরণ দ্বারা সম্যক্ ধর্ম্মসাধন বা ঈশ্বর-লাভ হয় না। ধর্ম্ম সাধকের অন্তরের বস্তু। হৃদয়ে বিশুদ্ধপ্রেম বা ভক্তিরসের সঞ্চার হইলেই জীব ভগবৎ-পদলাভের অধিকারী হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে ;—

"সংকীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনংহি পুংসাং।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ॥

অর্থাৎ—সূর্য্য যেমন অন্ধকারকে নাশ করে, অথবা প্রবলবায়ু যেরূপ মেঘরাশিকে উড়াইয়া দেয়, তদ্রূপ যিনি ভগবানের গুণানুবাদ কীর্ত্তন ও শ্রবণ করেন, ভগবান্ তাঁহার চিত্তে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার সমুদায় আসক্তিকে বিনাশ করিয়া থাকেন।

পুনরায় ভগবান্ বলিয়াছেন :—

মদ্‌গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ,
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং ॥

অর্থাৎ—গঙ্গার স্রোত যেমন স্বভাবতঃই সাগরের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ আমার গুণাবলীশ্রবণমাত্রে যাহার সমগ্র মনোগতি নিরবচ্ছিন্নভাবে আমারই পানে ধাবিত হয়, সেই ব্যক্তিই নির্গুণভক্তিযোগ-লাভের অধিকারী হয়।

উপর্য্যুল্লিখিত ভাগবতের বচনদ্বয়ের প্রথম বচন দ্বারা উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণ করিলে তিনি অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া শ্রোতাকে অনাসক্ত করেন। দ্বিতীয় বচনে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, আমার গুণানুবাদ-শ্রবণ মাত্র যদি শ্রোতার মন অবিচ্ছিন্নভাবে আমারই অভিমুখ হয়, তবেই সে শ্রোতা ভক্তিযোগের অধিকারী হয়। এইরূপে মনোগতি-পরিবর্ত্তন দ্বারা ভক্তিলাভেই ধর্ম্মের পূর্ণতা। ভক্তিপথাবলম্বীরা জগৎকে একটি পরম-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন—সেটি এই :—আমাদের প্রবৃত্তিনিচয়ের নিবৃত্তির আবশ্যক নাই। প্রেমভক্তির সাধন দ্বারা হৃদয়ের গতিকে বদলাইয়া দিলেই প্রবৃত্তিসকলের গতি আপনা আপনি ধর্ম্মের দিকে ফিরিয়া যাইবে। যে হস্ত সর্ব্বদা দুকর্ম্ম সাধন করিতে ব্যস্ত, যে পদদ্বয় নিয়ত কুস্থানে লইয়া যায়, সেই হস্তের অঙ্গুলিগুলি কর্ত্তন করিলে কিম্বা পদদ্বয়কে খঞ্জ করিয়া দিলে কিছুই ফললাভ হইবে না, বরং সাংসারিক দুর্গতির একশেষ হইবে। কিন্তু হৃদয় বদলাইয়া দাও, দেখিবে, হস্তদ্বয় স্বতঃই সৎকার্য্য সাধনে নিরত থাকিবে, পদদ্বয় যেখানে হরিগুণানুবাদকীর্ত্তন হয়, অতীব দুর্গম হইলেও তথায় লইয়া যাইবে। ধর্ম্মপথের পথিকদিগকে দুইটি প্রলোভন দুইদিক্ হইতে প্রবলরূপে আকর্ষণ করে। একদিকে সংসারাসক্তি, অপরদিকে বিরক্তি। কিন্তু ভক্তিমার্গ এমনই সরল যে ভক্তেরা অতি সহজভাবেই এই উভয় প্রলোভনকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। প্রবৃত্তিনিচয়ের সম্ভোগ বা তাহাদের বিনাশ, ইহার কোনটাই ভক্তের লক্ষণ নহে; ভক্ত কেবল ভগবানের

সেবা করিতে ও তাঁহার চরণে দাসখত লিখিয়া দিতে চান। প্রকৃত ভক্ত সুখ বা দুঃখ, শত্রুতা বা মিত্রতা, বিপদ বা সম্পদ্ এই সকল দ্বন্দ্বভাবের অতীত। তাঁহার মন ঐ সকলের অনেক উপরে। সত্যধর্ম্মের অনুসরণে এবং ঈশ্বরের শ্রবণ মননেই তাঁহার বিমলানন্দ। ভগবানের নিত্য দাস হইয়া তাঁহার আদেশ-পালনেই তিনি সুখানুভব করেন। ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্যদেব সাধ্যের নির্ণয় সম্বন্ধে রায় রামানন্দকে প্রশ্ন করায় তিনি প্রথমে বিষ্ণুপুরাণের একটি বচন পাঠ করেন যথা :—

"বর্ণাশ্রমাচারবতাপুরুষেণ পরঃপুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতেপন্থানান্যত্তোষকারণম্॥ অর্থাৎ

বর্ণাশ্রমাচারবিশিষ্ট ব্যক্তিই পরমপুরুষ বিষ্ণুর আরাধনার অধিকারী। বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমাচার ভিন্ন বিষ্ণুপ্রীতি-সাধনের অন্য উপায় নাই। তখন মহাপ্রভু রায় রামানন্দের মুখ হইতে উন্নততর সাধনভজনের তত্ত্ব ব্যক্ত করাইবার মানসে বলিলেন "এহ বাহ্য, আগে কহ আর"। ইহার গূঢ় অর্থ এই যে, কর্ম্মানুষ্ঠান প্রথম অধিকারীর জন্য, তদপেক্ষা উন্নত অধিকারীর সাধন কি, তাহা উল্লেখ কর। তখন রায় বলিলেন "কৃষ্ণেকর্ম্মার্পণ সর্ব্বসাধ্যসার"। এইরূপে ক্রমশঃ উচ্চতর সাধনতত্ত্ব সকলের বর্ণন করিয়া রায় যখন "প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার," বলিয়া প্রেমের অবস্থা-পরম্পরা বর্ণন করিলেন, তখন মহাপ্রভু নিরস্ত হইলেন। এই কথোপকথন পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সাধক ভগবানে যাবতীয় কর্ম্ম অর্পণ করিয়া অনাসক্তভাবে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিলে তাঁহার স্বরূপোপলব্ধি প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার আর আত্মাভিমান থাকে না, তিনি নিজেকে ভগবানের নিত্যদাস বলিয়া মনে করেন। তিনি যে কোন কর্ম্ম করেন, তাহার ফলাফল চিন্তা না করিয়া "দাস কেবল প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিতেছে" এইরূপ মনে করেন। তিনি ভগবান্ ও ভক্তের সেবাকেই জীবনের সার ভাবিয়া তাহাতেই কায়মনোবাক্যে রত থাকেন। সনাতন গোস্বামীর নিকট চৈতন্যদেব প্রেমভক্তিবর্ণনকালে বলিয়াছেন :—

"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধব-নারদৈঃ॥

জাতীয়াদি অপরাপর বিষয়ে মমতাশূন্য হইয়া একমাত্র ঈশ্বরে

প্রেম-সঙ্গত মমতা হইলেই তাহার নাম ভক্তি বলিয়া ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ কর্ত্তৃক ব্যক্ত হইয়াছে। মহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন:—

"সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈঃ ভক্তিরেবানুরস্যতে॥" অর্থাৎ

ভগবদ্ভক্তিরূপ রস, অভক্ত ব্যক্তির নিকট সর্ব্বথা দুরূহ কিন্তু যে ভক্তেরা ভগবৎপাদকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করেন, তাঁহারা অনায়াসে তাহার আস্বাদ প্রাপ্ত হন। বাঞ্ছাকল্পতরু হরি ভক্তের নিকট সহজেই ধরা দেন। ভক্তিরসে যাঁহাদের দোষ সকল প্রক্ষালিত হইয়াছে, যাঁহারা পাপশূন্য প্রসন্নাত্মা হইয়াছেন, যাঁহারা ভগবৎচর্চ্চানুরাগী ও ভক্তসঙ্গাভিলাষী, যাঁহারা প্রাণের সহিত ভগবান্‌কে একীভূত করিয়া তাঁহার চরণে রাগাত্মিকাভক্তি-সুখ অর্পণে সমর্থ, সেই সকল ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে ভক্তবৎসল হরি প্রেমময়রূপে প্রকাশিত হইয়া বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির ধর্ম্ম এই সংসারাসক্ত মানবসমাজে প্রচার করেন। ভক্তজীবনে ভক্তির স্ফুরণ বিষয়ে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীপ্যারীলাল দত্ত।

"ফলিত জ্যোতিষ।"

(১)

শিক্ষা কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ছয়টি বেদের অঙ্গ। ইহার মধ্যে আবার জ্যোতিষ বেদের চক্ষুস্বরূপ; কারণ এই শাস্ত্র দ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির বিষয় অবগত হওয়া যায়।

জ্যোতিষশাস্ত্র একদিন হিন্দুর পরম আদরের ধন ছিল। প্রাচীনকালের হিন্দুগণ এই শাস্ত্র আলোচনা করিয়া এতদ্বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন।

জ্যোতিষ দুইভাগে বিভক্ত গণিত ও ফলিত। গণিতজ্যোতিষ (Astronomy) দ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির গতি ও আকার-প্রকারাদির বিষয় জানিতে পারা যায়। ফলিত-জ্যোতিষের (Astrology) সাহায্যে আমরা মনুষ্যের ভাগ্য গণনা করিতে পারি।

কেহ কেহ ফলিতজ্যোতিষ বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মতে সূর্য্যাদি গ্রহগণ কখনও মানুষের পক্ষে সু-ফলদ অথবা কুফলদাতা হইতে পারে না। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ তাঁহারা বলেন যে—একটী লোকের কোষ্ঠীতে ৪৮ বৎসর ৬ মাস বয়সে বৃহস্পতির দশা পড়িবে লেখা আছে। তাহার ফল—

"রাজ্যাস্পদং তনয়বিত্ত-বিশালভোগান্,
পর্য্যাপ্তসৌখ্যং ধনধান্যসমাশ্রয়ঞ্চ।
ধর্ম্মার্থকাম-সুখভোগ-বহুপ্রয়োগং,
যাবদ্ বৃহস্পতিদশা পুরুষোহি তাবৎ॥"

কিন্তু রাজ্যলাভ ত দূরের কথা, একটি মকর্দ্দমায় পড়িয়া ভদ্রলোক ঐ সময়েই সর্ব্বস্বান্ত হয়। আবার কাহারও যখন শনির দশা পড়িল, তখন "মিথ্যা-বিবাদ-বধবন্ধ-নিরাশ্রয়ত্বং চৌরাদিভূপতিভুজঙ্গমভীতিমগ্নং"—ইত্যাদি কুফল-লাভের পরিবর্ত্তে সে সাহেবের সুনজরে পড়িয়া বড় মানুষ হইয়া গেল।

কিন্তু মনে রাখা উচিত, ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র কখনই মিথ্যা নহে। নব-গ্রহের বলাবল ও শুভাশুভত্বের উপর মানব-জীবনের সমুদয় ফল নির্ভর করে। শাস্ত্রজ্ঞানহীন সাধারণ জ্যোতির্ব্বিদেরা নবগ্রহের বলাবল ও শুভা-শুভত্ব বিচার না করিয়াই কোষ্ঠীতে পুস্তকের লিখিত একটি "বাঁধা গদ্" লিখিয়া বসেন। কাজে কাজেই ফলেরও বিষম অনৈক্য ঘটে।

ফলিতজ্যোতিষ অগাধসমুদ্রতুল্য শাস্ত্র। ইহার মধ্যে নবগ্রহের বলাবল, শুভাশুভত্ব ও দৃষ্টি-যোগাদি সম্বন্ধে অনেক বিচার আছে। আমরা এই প্রবন্ধে সেই সকল কথারই আলোচনা করিব।

রবি (Sun), চন্দ্র (Moon), মঙ্গল (Mars), বুধ (Mercury) বৃহস্পতি (Jupiter), শুক্র (Venus), শনি (Saturn), রাহু (Dragon's head), ও কেতু (Dragon's tail), এই নয়টি গ্রহ * আকাশস্থ এক কল্পিত রাশিচক্রে (Zodiac), নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে। ঐ রাশিচক্র মেষ (Aries), বৃষ (Taurns), মিথুন (Gemini), কর্কট (Cancer), সিংহ (Leo), কন্যা (Virgs), তুলা (Libra), বৃশ্চিক (Scorpion), ধনু (Sagittarius), মকর (Capricorn), কুম্ভ (Aquarius), ও মীন

* রাহু-কেতু বাস্তবপক্ষে গ্রহ না হইলেও জাগতিক জীবের উপর উহাদের বিলক্ষণ প্রভাব দৃষ্ট হয়—এজন্য হিন্দুজ্যোতিষশাস্ত্রকর্ত্তারা উহা-দিগকে গ্রহমধ্যে গণনা করিয়া গিয়াছেন।

(Pisces), নামে দ্বাদশ সমানভাগে বিভক্ত। এই দ্বাদশরাশির অপর নাম ক্রিয়, তাবুরি, জিতুম, কুলীর, লেয়, পাথেয়, যুক্, কৌর্পাখ্য, তৌক্ষিক, আকোকের, হৃদ্রোগ ও অন্ত্যভ।

প্রত্যেক রাশির পরিমাণ ৩০ অংশ (30 degrees) এবং উহা সওয়া দুই নক্ষত্র দ্বারা গঠিত। অশ্বিনী, ভরণী প্রত্যেকের ৪ পাদ এবং কৃত্তিকার ১ পাদ দ্বারা মেষরাশি; কৃত্তিকার অবশিষ্ট ৩ পাদ, রোহিণীর ৪ পাদ এবং মৃগশিরার ২ পাদ দ্বারা বৃষরাশি—এইরূপ অশ্বিনী হইতে রেবতী পর্য্যন্ত ২৭টি নক্ষত্রের দ্বারা দ্বাদশরাশি গঠিত।

আর্য্যঋষিরা দ্বাদশরাশি ও তন্মধ্যস্থ নবগ্রহের এক একটি মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। উহা দ্বারাই মানবের স্বরূপ ও স্বভাবজ্ঞান হয়।

মেষ—অগ্নিরাশি; পুরুষ; পিত্তপ্রকৃতি। বৃষ—পৃথ্বীরাশি; স্ত্রী; বায়ু-প্রকৃতি। মিথুন—বায়ুরাশি; পুরুষ; বায়ু-পিত্ত-কফ-প্রকৃতি। কর্কট—জলরাশি; স্ত্রী; কফপ্রকৃতি। সিংহ—অগ্নিরাশি; পুরুষ; পিত্তপ্রকৃতি; কন্যা—পৃথ্বীরাশি; স্ত্রী; বায়ুপ্রকৃতি। তুলা—বায়ুরাশি; পুরুষ; বায়ুপিত্ত-কফ-প্রকৃতি। বৃশ্চিক—জলরাশি; স্ত্রী; কফপ্রকৃতি। ধনু—অগ্নিরাশি; পুরুষ; পিত্তপ্রকৃতি। মকর—পৃথ্বীরাশি; স্ত্রী; বায়ুপ্রকৃতি। কুম্ভ বায়ু-রাশি; পুরুষ; বায়ু-পিত্ত-কফপ্রকৃতি এবং মীন জলরাশি; স্ত্রী ও কফ-প্রকৃতি।

নবগ্রহের মধ্যে রবি—খর্ব্বাকৃতি; অরুণশ্যামবর্ণ; পিত্তপ্রকৃতি; তিক্ত-রসপ্রিয় ও স্থিরস্বভাব। চন্দ্র—গৌরবর্ণ; পুষ্টদেহ; কফবাতপ্রকৃতি ও লবণরসপ্রিয়। মঙ্গল—রক্তগৌরবর্ণ; তমোগুণপ্রধান; হিংস্র; সাহসী; পিত্তপ্রকৃতি; উদার অথচ অল্পগর্ব্বিত। বুধ—শ্যামবর্ণ; মধ্যমাকার; রজো-গুণপ্রধান; বাতপিত্ত ও কফপ্রকৃতি এবং সর্ব্বদা বালকের ন্যায় স্বভাব-বিশিষ্ট। বৃহস্পতি—পীতবর্ণ; খর্ব্বদেহ; সত্বগুণবিশিষ্ট; সমপ্রকৃতি ও মধুররসপ্রিয়। শুক্র—শ্যামবর্ণ, রজোগুণবিশিষ্ট; ক্রীড়াকৌতুকরত এবং অম্লরসপ্রিয়। শনি—কৃষ্ণবর্ণ; দীর্ঘকেশদেহ; চপল; খলস্বভাব ও কুপিত-বায়ুপ্রকৃতি। রাহু-কেতু—কৃষ্ণবর্ণ; ক্রূর এবং অতি ভয়ঙ্কর।

সূর্য্যাদি গ্রহগণ রাশিচক্রে বামাবর্ত্তক্রমে অর্থাৎ মেষ হইতে বৃষ, বৃষ হইতে মিথুন ইত্যাদি ক্রমে পরিভ্রমণ করে। রাহু-কেতুর গতি বিপরীত—অর্থাৎ এই দুইগ্রহ দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে মেষ হইতে মীন, মীন হইতে কুম্ভে গমন করে।

শাস্ত্রে গ্রহগণের রাশিভোগের কাল এইরূপ লিখিত আছে ;—

"রবির্মাসং নিশানাথঃ সপাদদিবসদ্বয়ম্।
পক্ষত্রয়ং ভূমিপুত্রো বুধোঽষ্টাদশবাসরান্।
বর্ষমেকং সুরাচার্য্যশ্চাষ্টাবিংশদ্দিনং ভৃগুঃ।
শনিঃ সার্দ্ধদ্বয়ং বর্ষং স্বর্ভানুঃ সার্দ্ধবৎসরম্" ॥

মোটামুটি হিসাবে সূর্য্য একরাশিতে পূর্ণ একমাস ; চন্দ্র ২ দিন ১৫ দণ্ড ; মঙ্গল দেড়মাস ; বুধ ১৮ দিন ; বৃহস্পতি ১ বৎসর ; শুক্র ২৮ দিন ; শনি ২ বৎসর ৬ মাস এবং রাহু-কেতু প্রত্যেকে ১ বৎসর ৬ মাস অবস্থিতি করে। তাহা হইলে দেখা গেল, দ্বাদশরাশি পরিভ্রমণ করিতে রবির ১ বৎসর ; চন্দ্রের ২৭ দিন ; মঙ্গলের ৫৪০ দিন ; বুধের ২১৬ দিন ; বৃহস্পতির ১২ বৎসর ; শুক্রের ৩৩৬ দিন ; শনির ৩০ বৎসর এবং রাহু-কেতু প্রত্যেকের ১৮ বৎসর সময় লাগে। কিন্তু অনেকসময় অনেক কারণে গ্রহগণের গতির ন্যূনাধিক্য হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রাশি-ভোগকালেরও হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া পড়ে।

জন্মকালীন লগ্ন স্থির ও রাশিচক্রে নবগ্রহ সন্নিবেশ করিয়া গ্রহগণের বলাবল-বিচারপূর্ব্বক জাতকের ভাগ্যফল নির্ণয় করিতে হয়। রাশিচক্রে গ্রহ সন্নিবেশ করিবার সহজ প্রণালী এইরূপ ;—

পঞ্জিকায় প্রত্যেক মাসের প্রথমে একটি করিয়া রাশিচক্র দেওয়া আছে। ঐ রাশিচক্রের সঙ্গেই সেই মাসের কোন্ তারিখে কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিতে সঞ্চারিত হইবে তাহারও একটি তালিকা দেওয়া থাকে। ঐ তালিকায় রবি ও চন্দ্রের সঞ্চারের কথা লেখা থাকেনা, কারণ রবি বৈশাখমাসে মেষরাশিতে, জ্যৈষ্ঠমাসে বৃষরাশিতে—এইরূপভাবে এক এক রাশিতে পূর্ণ একমাসকাল অবস্থিতি করে। চন্দ্রের সঞ্চার প্রত্যেক দিন পঞ্জিকার পার্শ্বেই লেখা থাকে।

পঞ্জিকার লিখিত সঞ্চার-তালিকা দৃষ্টে অভীষ্টসময়ে কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিতে থাকিবে নিশ্চয়করতঃ রাশিচক্রে তাহাদিগকে সেই সেই স্থলে স্থাপন করিতে হয়। মনে করুন্—১৩২৫ সালের ১৫ই কার্ত্তিক বেলা ১৫ দণ্ড ৩০ পল সময়ে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করিল। তাহার জন্য কুণ্ডলী প্রস্তুত করিতে হইবে। পঞ্জিকায় দেখিলাম (১৩২৫ সালের পি, এম্, বাক্‌চির পঞ্জিকা দেখুন) কার্ত্তিকমাসের প্রথম রাশিচক্রে রবি ও বুধ তুলায় ; চন্দ্র কুম্ভে ; মঙ্গল ও রাহু বৃশ্চিকে ;

বৃহস্পতি মিথুনে, শুক্র কন্যায়; শনি সিংহে এবং কেতু বৃষে রহিয়াছে। কিন্তু, সঞ্চার-তালিকায় দেখিতেছি, ১লা কার্ত্তিক ৩২ দণ্ড ৪৯ পলে শুক্র চিত্রানক্ষত্রে; ২রা ১৭ দণ্ড ৯ পলে বুধ স্বাতীনক্ষত্রে ৫ই ৫৩ দণ্ড ৪ পলে শুক্র তুলারাশিতে; ৯ই ৫৬ দণ্ড ৩ পলে বুধ বিশাখানক্ষত্রে এবং ১২ই ১৩ দণ্ড ২২ পলে শুক্র স্বাতীনক্ষত্রে যাইবে। ১৫ই তারিখের দিনপঞ্জিকার পার্শ্বে দেখিলাম, সে দিবস চন্দ্র কন্যারাশিতে রহিয়াছে। সুতরাং বুঝা গেল, ঐ শিশুর জন্মসময়ে গ্রহগণ রাশিচক্রে এইভাবে অবস্থিত আছে;—

[রাশিচক্রে গ্রহনামের আদ্যক্ষরই লিখিত হয়; যথা র, চ, ম, বু, অর্থাৎ রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ। গ্রহগণের পশ্চাতে যে অঙ্ক রহিয়াছে সেটি নক্ষত্রাঙ্ক]

জাতকের জন্মলগ্ন নির্ণয় করিতে হইলে পঞ্জিকার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। দিবারাত্রির মধ্যে দ্বাদশরাশির উদয় হয়। সূর্য্যোদয়ের সময়ে যে লগ্নের উদয় হয় তাহাকে উদয়লগ্ন এবং সূর্য্যাস্তসময়ে যে লগ্নের উদয় হয় তাহাকে অস্তলগ্ন বলে। সকল লগ্নেরই একটি পরিমাণ আছে। তবে সকল দেশের লগ্নমান সমান নহে। কলিকাতা ও তৎপূর্ব্ব-পশ্চিম-দেশের অয়নাংশশুদ্ধ লগ্নমান এইরূপ;—

	দণ্ড	পল	বিপল
মেষ	৪	৮	৫০
বৃষ	৪	৫২	৩৪
মিথুন	৫	৩১	৩৩
কর্কট	৫	৩৯	৪০
সিংহ	৫	২৮	৪৬
কন্যা	৫	২৪	৫৯

	দণ্ড	পল	বিপল
তুলা	৫	৩৪	২৫
বৃশ্চিক	৫	৩৯	৫২
ধনু	৫	১৬	১২
মকর	৪	৩০	৩৭
কুম্ভ	৩	৫৫	১২
মীন	৩	৪৭	১০

পঞ্জিকার প্রত্যেক তারিখে কোন্ লগ্নের কত অংশ ভোগ করিয়া সূর্য্যের উদয় এবং কোন্ লগ্নের কত অংশ ক্ষয় করিয়া অস্ত তাহা লিখিত আছে। উদয়লগ্নের পূর্ণমান হইতে ভুক্তাংশ বাদ দিয়া তাহাতে পর পর লগ্নমান যোগ করিলেই অভীষ্টসময়ের লগ্ন নিরূপণ করা যায়।

১৩২৫ সালের ১৫ই কার্ত্তিক বেলা ১৫ দণ্ড ৩০ পল সময়ে যে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তাহার লগ্ন নিরূপণ করিতে যাইয়া প্রথমে পঞ্জিকা খুলিয়া দেখিলাম—১৫ই কার্ত্তিক তুলালগ্নের ২ দণ্ড ৪৫ পল ৪১ বিপল গতে সূর্য্যোদয়। তুলার পূর্ণমান ৫ দণ্ড ৩৪ পল ২৫ বিপল। ঐ পূর্ণলগ্নমান হইতে ভুক্তাংশ বাদ দিলে ২ দণ্ড ৪৮ পল ৪৪ বিপল রহিল। এইবার ইষ্ট সময় না পাওয়া পর্য্যন্ত পর পর লগ্নমান যোগ করিতে হইবে।

	দণ্ড	পল	বিপল
তুলালগ্নের ভোগ্যমান	২	৪৮	৪৪
বৃশ্চিক লগ্নমান	৫	৩৯	৫২
সমষ্টি	৮	২৮	৩৬
ধনু লগ্নমান	৫	১৬	১২
সমষ্টি	১৩	৪৪	৪৮
মকর লগ্নমান	৪	৩০	৩৭
সমষ্টি	১৮	১৫	২৫

এইস্থলে শিশুর মকরলগ্নই স্থির হইল; কারণ তাহার জন্মসময় দিবা ১৫ দণ্ড ৩০ পল ঐ মকরলগ্নের মধ্যেই পড়িল।

জন্ম-সময়ে যে রাশিতে চন্দ্র অবস্থিতি করে, সেইটিই জাতকের রাশি বলিয়া অভিহিত হয়। এই শিশুটির জন্মসময়ে চন্দ্র কন্যারাশিতে রহিয়াছে; সুতরাং ইহার কন্যারাশি—বুঝিতে পারিলাম।

লগ্ন ও রাশি দ্বারা জাতকের আকৃতি-প্রকৃতির একটা স্থূলজ্ঞান লাভ করা যায়।

মেষলগ্নে জন্ম হইলে কোপনস্বভাব, লুব্ধ, কৃশ, বিদেশ-গমনে অনুরক্ত, অল্পসৌখ্য ও স্খলিতপ্রতিজ্ঞ; বৃষে শূর, ক্লেশসহনশীল ও শত্রুহন্তা; মিথুনে বিনীত, মৃদুস্বভাব, বদান্য ও সংগীতমনা; কর্কটে মেধাবী, দাতা, দেব-দ্বিজ-সেবাপরায়ণ, কফবহুল ও বহুবাক্; সিংহে মাংসপ্রিয়, অল্পভাষী, পর্ব্বত-বনানুসারী, দৃঢ়সুহৃদ্ ও পরদাররত; কন্যায় মাধুর্য্যযুক্তদেহ, স্ত্রীপ্রকৃতি, সুগঠন, বিবর্জ্জিতকফ ও সৌভাগ্যশালী; তুলায় দীর্ঘমুখ, দীর্ঘদেহ, মেধাবী, ভ্রাতৃপ্রিয় ও সুবন্ধু; বৃশ্চিকে স্থূলদীর্ঘদেহ, কুটিলান্তঃকরণ, গম্ভীর ও পিত্ত-রোগী; ধনুতে খর্ব্বনাসিক, স্থূলবদন, বিজ্ঞানকুশল ও স্বধর্ম্মনিরত; মকরে কৃশগাত্র, ভীরুস্বভাব, অহঙ্কারী ও বায়ুপ্রকৃতি; কুম্ভে খর্ব্ব, অলস, দ্যূতপ্রিয় ও মলিন এবং মীনে স্ফুটনাসিক, প্রশস্তচক্ষু, ধীর, ভোগান্বিত ও কন্দর্প-বিদ্যানিপুণ হইয়া থাকে।

অপরপক্ষে মেষরাশির মানব চঞ্চল, ত্যাগশীল ও অল্পমেধা; বৃষের স্থূলচক্ষু, অল্পকথনশীল, রমাদেহ, ও দেবদ্বিজভক্ত; মিথুনের মৃদুগতি, পরজনহিতকারী ও অস্পষ্টবাক্যযুক্ত; কর্কটের বিপুলবক্ষ, প্রবলকফযুক্তদেহ ও নম্র; সিংহের উদরভরণতুষ্ট, ক্রোধী, মাংসলোভী ও উচ্চবক্ষ; কন্যার কৃশদেহ, কমনীয়, বীরস্বভাব ও গুরুজনের হিতকারী; তুলার শিথিলগাত্র, বহুভাষী ও ভৃত্যানুরক্ত; বৃশ্চিকের ধন-জন-ভাগ্যসম্পন্ন, খলবুদ্ধি ও শূর; ধনুর গুণযুক্ত, কীর্ত্তিমান্, সহিষ্ণু ও মৃদুগতি; মকরের কৃশতনু, বুদ্ধিমান্ ও বন্ধুবর্গের ভোক্তা; কুম্ভের সুন্দর, স্বচ্ছচিত্ত, পরজনহিতকারী ও জ্ঞাতিবন্ধুপ্রমোদী এবং মীনের লোকগুলি প্রায়ই প্রকাশিতকান্তি, স্ত্রীজিত ও ধনলোভী হয়।

[ক্রমশঃ]

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-বিশারদ।

গীতায় আত্মানাত্মবিচার।

প্রথম দেখি—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬

যাহা অসৎ তাহার কখনও সত্তা নাই, এবং যাহা সৎ তাহার কখনও বিনাশ নাই। তত্ত্বদর্শিগণ সৎ ও অসৎ এই উভয়ের চরম দেখিয়াছেন।

এখানে দেখা যাইতেছে—অসৎঃ—দেহ ও তাহার ধর্ম্ম শীতোষ্ণাদি সর্ব্বদা একরূপ থাকেনা—উহারা সকারণ ও বিকার বলিয়া উহাদিগকে অসৎ বা অবিদ্যমান বলা হইয়াছে। যেমন ঘটাদি মৃত্তিকার বিকার বলিয়া, তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া দেখিলে, তাহাদের কারণ মৃত্তিকা ভিন্ন অপর কিছুই উপলব্ধ হইবে না, সেইরূপ সমস্ত বিকারময় পদার্থ তাহাদের কারণ ব্যতিরেকে উপলব্ধি হয় না—সুতরাং যেমন ঘটাদি অসৎ ও মৃত্তিকাই সৎ, সেইরূপ দেহাদিও অসৎ। উহারা জন্মের পূর্ব্বে ছিল না, এবং মৃত্যুর পরও থাকিবে না; উহারা অনিত্য এবং পুনঃ পুনঃ রূপান্তরিত হয়—এজন্য উহাদিগকে অসৎ বলা হইয়াছে।

ভাবঃ—পারমার্থিক অস্তিত্ব। দেহাদির পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই; ব্যবহারিক অস্তিত্ব আছে। কিন্তু ব্যবহারিক অস্তিত্বের কথা এখানে বলা হইতেছে না।

সৎ—সৎস্বরূপ আত্মা। আত্মা সকারণ নহে; এবং উহার বিকার, রূপান্তর বা বিনাশ নাই। অতএব আত্মা সৎপদার্থ।

অভাবঃ—আত্মার কখনও অবিদ্যমানতা ঘটে না।

সুতরাং তত্ত্বদর্শিদিগের দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া, দেহীকে অবিনাশী ও দেহকে বিনাশী জানিয়া, শোক-মোহ ত্যাগ করিয়া শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সকল উপেক্ষা কর।

এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ আত্মার সদ্ভাব ও দেহাদির যে অসদ্ভাবের উল্লেখ করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন।

অবিনাশী তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭

যিনি এই সকল দেহাদি ব্যাপিয়া আছেন, আত্মস্বরূপ তাঁহাকে অবিনাশী জানিও। কেহই এই অব্যয় আত্মাকে বিনাশ করিতে পারেনা।

দেখা যায়—"নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" পূর্ব্বশ্লোকের এই সামান্য উক্তি এইশ্লোকে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮॥

নিত্য, অবিনাশী এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন আত্মার এই সকল দেহ বিনাশী বলিয়া কথিত। হে ভারত, অতএব তুমি যুদ্ধ কর।

আলোচনা করিলে বুঝা যায়—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" এই সামান্য উক্তি এখানে বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে। শ্লোকের অপ্রমেয় কথার অর্থ—আত্মা প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। আত্মা স্বপ্রকাশ। যেমন সূর্য্য নিজে প্রকাশিত হইয়া জগৎকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ জ্ঞানময় স্বয়ং-জ্যোতি-স্বরূপ আত্মা নিজে প্রকাশিত হইয়া সমুদায় অনাত্মবস্তুকে প্রকাশ করেন। যদি বলা যায় যে, শাস্ত্র দ্বারা আত্মা প্রমাণিত হন, তবে তাহা ঠিক নহে। শাস্ত্র কেবল "নেতি নেতি" বাক্য দ্বারা আত্মায় অধ্যারোপিত অতদ্ধর্ম্মাত্মক সমুদায় অনাত্মপদার্থ নিরসন করিয়া, "তত্ত্বমসি" বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা স্বয়ং-ভাসমান আত্মার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে মাত্র। যেমন মেঘ অপসারিত হইলে সূর্য্য স্বয়ং প্রকাশিত হয়, সেইরূপ শাস্ত্র আত্মসম্বন্ধে ভ্রম নিরসন করিলে, আত্মা স্বয়ংই বিরাজিত থাকেন। শাস্ত্র যে অজ্ঞাত আত্মাকে জ্ঞাপন করে তাহা নহে। শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, মন বুদ্ধি প্রভৃতির সম্বন্ধেও তাহাই। আত্মা দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা; মন বুদ্ধি প্রভৃতি যাবতীয় অনাত্মপদার্থ দৃশ্য ও জ্ঞেয়। আত্মা যদি প্রমেয় হন, তাহা হইলে দৃশ্য বা জ্ঞেয় হইলেন। কর্ত্তৃকর্ম্ম-বিরোধ-হেতু তাহা অসম্ভব। জ্ঞাতা কখনও জ্ঞেয় হইতে পারেন না, দ্রষ্টা কখনও দৃশ্য হইতে পারেন না। সুতরাং মন বা বুদ্ধি দ্বারা আত্মাকে কখনও জানিতে পারা যায় না। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।" "যাহা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ জানা যায়, তাঁহাকে কাহা দ্বারা জানিবে? বিজ্ঞাতাকে কাহা দ্বারা জানিবে?" "নতত্র চক্ষুর্গচ্ছতি নবাগ্ গচ্ছতি ন মনঃ।" "তিনি চক্ষুঃ, মনঃ বা বাক্যের গম্য নহেন।"

"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে কশ্চনৈনম্, নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।" "কেহ তাঁহাকে চক্ষুঃ বা অপর কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা, তপস্যা—কর্ম্ম দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না" "যদ্ বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে" "যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্", "যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি", "যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেনশ্রোত্রমিদং শ্রুতম্,"—"যিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হন না, যাঁহা কর্ত্তৃক বাক্য প্রকাশিত হয়," "যাঁহাকে মনের দ্বারা মনন করিতে পারা যায় না, যিনি মনকে জানেন," যাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না, যাঁহার সাহায্যে চক্ষুঃ দেখে," "যাঁহাকে কর্ণ দ্বারা শুনিতে পাওয়া যায় না, যাঁহার সাহায্যে কর্ণ শুনে,"—ইত্যাদি বহু শ্রুতিবাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে "অবাঙ্‌মনসোগোচরম্" আত্মা জ্ঞানের বিষয় নহেন। যাহা কিছু আমরা বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা জানি, তৎসমুদায়ই অচেতন ও জ্ঞেয়; এবং আত্মাই চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞাতা। জ্ঞাতাকে জ্ঞেয়রূপে জানা অসম্ভব। তবে কি আত্মাকে জানা যায় না? জানা যায় বই কি; কিন্তু তাহা জ্ঞেয়রূপে নহে, জ্ঞাতৃরূপেই। যোগাবস্থায় ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি সমুদায় চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে, অর্থাৎ উহারা বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নিশ্চলভাবে অবস্থিত থাকিলে, যখন কেবলমাত্র স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপে অবস্থিত আত্মা বিরাজ করিতে থাকেন, তখন তাহাই আত্মজ্ঞানরূপে কথিত হয়। শ্রুতি বলিতেছেন,—"অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং, মত্বাধীরো হর্ষশোকৌজহাতি," "অধ্যাত্মযোগ দ্বারা দেবকে জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি হর্ষশোক অতিক্রম করেন।" "তমক্রতুঃ (অকামঃ) পশ্যতি বীতশোকো, ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ।" (ধাতুপ্রসাদাৎ—মনআদিশরীরধারকানাং প্রসন্নাবস্থাহেতোঃ)—"অকাম ও বীতশোক সাধক মন, বুদ্ধি প্রভৃতি শরীরধারক বৃত্তিসকলের প্রসন্নাবস্থা হইলে আত্মমহিমা দর্শন করেন।" "প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।" "ইহাঁকে প্রজ্ঞানের দ্বারা পাওয়া যায়।" "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।" "সূক্ষ্মদর্শিগণ সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দেখেন।" "কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।" "কোন ধীর ব্যক্তি মুক্তির অভিলাষী হইয়া বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া প্রত্যগাত্মাকে দেখিলেন।" ইত্যাদি বহু শ্রুতিবাক্য দ্বারা জানা যায় যে, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যোগে নিশ্চল হইলেই আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হন। সুতরাং আত্মা যে অপ্রমেয় ও স্বপ্রকাশ, তাহা এক্ষণে স্পষ্ট অবধারিত হইল।

এখানে যুধ্যস্ব—কথা দ্বারা যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা বিধান করা হইতেছে না। যুদ্ধে প্রবৃত্ত অর্জ্জুন শোক-মোহ দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিলেন; সেই কর্ত্তব্যের প্রতিবন্ধক শোক-মোহের অপনয়ন মাত্র করা হইতেছে। বলা হইতেছে—"অতএব তুমি স্বধর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া, শোক-মোহ ত্যাগ করিয়া, যুদ্ধ কর।"

অতঃপর বলা হইতেছে—

য এনং বেত্তিহন্তারং যশ্চৈনং মন্যতেহতম্।
উভৌতৌন বিজানীতোনায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯

যে ব্যক্তি আত্মাকে হন্তা মনে করে এবং যে ব্যক্তি আত্মাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই প্রকৃততত্ত্ব জানেনা; আত্মা হননও করেন না, হতও হন না।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিলেন, তাহা যে শ্রুতিসিদ্ধ, তাহা দেখাইবার জন্য শ্রীভগবান্ কঠোপনিষৎ হইতে দুইটী ঋক্ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিতেছেন। ঋক্ দুইটী উপনিষদে নিম্নলিখিতরূপে আছে;—

"হন্তাচেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌতৌন বিজানীতোনায়ং হন্তি ন হন্যতে॥"

"নজায়তে ম্রিয়তেবা বিপশ্চি— (বিপশ্চিৎ-মেধাবী, জ্ঞানবান্ আত্মা)
ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো-
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

এতন্মধ্যে প্রথম ঋক্টী এই শ্লোকে বলিয়া, এই শেষোক্ত ঋক্টী পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিবেন। আত্মা হনন-ক্রিয়ার কর্ত্তাও নহেন, কর্ম্মও নহেন। আত্মা দ্রষ্টামাত্র, আত্মাবভাসিত বুদ্ধিই অহঙ্কাররূপে প্রকৃতপ্রস্তাবে কর্ত্তা হইতেছে। সুতরাং তুমি যদি তোমাকে হন্তা মনে কর, তাহা তোমার ভ্রম; সেইরূপ ভীষ্মদ্রোণাদিও যে হত হইবেন, তাহাও নহে।

আত্মার বিনাশ নাই—এখানে তাহাই বলিতেছেন—

নজায়তে ম্রিয়তেবা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতাবান ভূয়ঃ।
অজোনিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো-
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০

ইনি কখনও জন্মেন না বা মরেণ না, জন্মগ্রহণ করিয়া যে ভবিষ্যতে পুনরায়

বিনষ্ট হইবেন, তাহাও নহে, (কিম্বা, বিনষ্ট হইয়া যে ভবিষ্যতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবেন তাহা নহে), ইনি জন্ম-রহিত নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ; শরীর হত হইলেও ইনি হত হন না।

আত্মা যে ষড়্‌বিধবিকাররহিত, তাহা এখানে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। ন জায়তে—জন্মরহিত; ন ম্রিয়তে—মৃত্যুরহিত; নায়ং ভূত্বা ইত্যাদি—মৃত্যুর পর পুনরায় অস্তিত্বহীন; নিত্যঃ—সর্ব্বদা একরূপ, সুতরাং বৃদ্ধিরহিত; শাশ্বতঃ—শশ্বৎ অর্থাৎ সর্ব্বদা বর্ত্তমান, সুতরাং ক্ষয়রহিত; পুরাণঃ—পুরা অর্থাৎ পূর্ব্ব, এবং নব অর্থাৎ এইক্ষণ,—এই উভয় সময়েই একরূপ, সুতরাং পরিণামরহিত। অতএব আত্মা যখন সর্ব্ববিধ-বিকার-রহিত, তখন দেহ বিনষ্ট হইলেই বা আত্মা কিরূপে বিনষ্ট হইবেন?

তত্ত্বজ্ঞের কাছে মৃত্যু অকিঞ্চিৎকর, তাহা এস্থানে বলা হইতেছে—

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১

হে পার্থ! যিনি ইহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া জানেন, তিনি কিরূপে কাহাকে বধ করান, কাহাকেই বা বধ করেন?

বুঝিতে হইবে—আত্মা যখন জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি ও ক্ষয়-রহিত হইতেছেন, তখন তাঁহার বিনাশ অসম্ভব। সুতরাং আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপে কাহাকে বধ করেন বা করান? তাৎপর্য্য এই যে, স্বধর্ম্ম-সাধনার্থ অর্জ্জুন যদি নিরহঙ্কার হইয়া যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রাণিহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হইবে না; এবং তাঁহাকে কর্ম্মে নিয়োগ করার জন্য শ্রীভগবান্‌ও পাপে লিপ্ত হইবেন না। কারণ, কর্ত্তব্য-বোধে নিরহঙ্কার হইয়া কর্ম্ম করিলে, কর্ম্ম করা সত্ত্বেও কর্ম্ম করা হয় না, যে হেতু সেইরূপে কৃত কর্ম্মের ফল কর্ম্মীকে স্পর্শ করিতে পারে না। ঈশ্বরের নিয়োগে আমাদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেই হইবে; সেই স্থলে যদি আমরা অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া নির্ব্বিকার দ্রষ্টা আত্মাকে কর্ত্তা মনে করি, তাহা হইলেই আমাদের কর্ম্ম-জন্য বন্ধন হয়, কিন্তু যদি আত্মার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়া, যেমন জবার রক্তাভা তৎসংসর্গী স্ফটিকে প্রতিফলিত হইলেও তদ্দ্বারা স্ফটিক প্রকৃতপ্রস্তাবে বিকৃত হয় না, সেইরূপ বুদ্ধি-সন্নিহিত অবিক্রিয় আত্মা, বুদ্ধির বিষয়-সংসর্গজ বিকার ও চেষ্টামূলক কর্ম্ম দ্বারা বিকৃত হন না,—এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া, দ্রষ্টা মাত্র স্বরূপে ভগবৎ-প্রেরণাধীনে চালিত বুদ্ধিকৃত কর্ম্মে কেবলমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া যাই, তাহা

হইলে কর্ম্ম-জন্য সুখ-দুঃখ-ফলপ্রদ কর্ম্মবন্ধন কেন হইবে? কিন্তু যদি অবিদ্যা-ভিভূত হইয়া আত্মাবভাসিত বুদ্ধিতে আত্মার আরোপ করিয়া অহঙ্কারে প্রমত্ত হই, তাহা হইলে তরঙ্গায়িত সলিলবক্ষে প্রতিফলিত চন্দ্রের ন্যায় ভবসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে হইবে।

এখানে যে সকল ব্যাখ্যাতৃগণ কর্ম্মসন্ন্যাসের পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের মত সমীচীন নহে; কারণ এখানে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে নিরহঙ্কার হইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে উপদেশ দিতেছেন। সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসের কথা এখানে আসিতেই পারে না। শ্রীভগবদ্বাক্যের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিয়া স্বমতপোষণার্থ যাঁহারা বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যা অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে শ্রীভগবানের অভিমত যথাযথ বুঝিতে হইবে। হৃদ্দেশাধিষ্ঠিত শ্রীভগবান্ই আমাদিগকে সাহায্য করিবেন।

অতঃপর জন্মমৃত্যু-প্রহেলিকার সমাধানে বলা হইয়াছে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২২॥

যেমন মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণশরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর ধারণ করেন।

যদি বল যে, দেহীর বিনাশ না হইলেও দেহ বিনষ্ট হইবে, সুতরাং যুদ্ধে বিনষ্ট স্বজনগণের এই অপকার আমা কর্ত্তৃক কৃত হইবে; তাহাও ঠিক্ নহে। কারণ, দেহত্যাগে আত্মার কোনও ক্ষতি নাই। পুরাতন-বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতনবস্ত্রগ্রহণের ন্যায় দেহীও জীর্ণ-দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন-দেহ গ্রহণ করেন মাত্র। পরমধার্ম্মিক ভীষ্মদ্রোণাদি যদিও আপাত-মোহে অভিভূত হইয়া, ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়া পূর্ব্বসুকৃতিবশে উৎকৃষ্টতর গতি লাভ করিবেন, সুতরাং তাঁহাদের জন্য শোকের কারণ নাই। আর অধর্ম্মে আসক্ত দুর্য্যোধনাদিও যুদ্ধে নিহত হইয়া আবার স্বকৃতকর্ম্মানুযায়ী দেহ লাভ করিবেন, তজ্জন্য তাঁহাদেরও কোনও ক্ষতি হইবেনা। ইঁহারা যখন ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তখন ইঁহাদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে বিনষ্ট করিয়া অধর্ম্মের পথ হইতে অপসারিত করা তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য; তাহাতে তোমার কোনও প্রত্যবায় নাই, বা তজ্জন্য বিষাদগ্রস্ত হইবার কোনও কারণ নাই।

আত্মা অক্ষয় অবিনশ্বী. কোনও মতে আত্মার বিকৃতি ঘটে না, তাহাই বলিতেছেন।

নৈনং চ্ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপোনশোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩॥

শস্ত্র-সকল ইহাঁকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাঁকে ভস্মীভূত করিতে পারে না, জল ইহাঁকে আর্দ্র করিতে পারে না এবং বায়ু ইহাঁকে শুষ্ক করিতে পারে না। দেহনাশে তদন্তর্বর্ত্তী আত্মা বিনষ্ট না হইয়া কিরূপে অবিক্রিয় থাকেন, তাহাই এখানে বিশেষ করিয়া বুঝান হইয়াছে।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি। ২৫॥

আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল, সনাতন—অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং অবিকার্য্য। অতএব আত্মাকে এইরূপ জানিয়া অনুশোচনা করিও না।

শ্রীভগবান্ আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে যে সমস্ত উপদেশ দিলেন, তাহা এখানে সংগ্রহ করিয়া উপসংহার করিতেছেন।

অচ্ছেদ্য, অশোষ্য—পরস্পর-নাশহেতু ভূতসকল আত্মাকে নাশ করিতে পারে না।

নিত্য—অবিনাশী।

সর্ব্বগত—সর্ব্বব্যাপী, বিভু।

স্থাণু—স্থির, অবিকারী।

অচল—পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া নূতনরূপ গ্রহণ করেন না।

সনাতন—চিরন্তন, সর্ব্বদা একরূপ এবং অনাদি।

অব্যক্ত—চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর।

অচিন্ত্য—মন ও বুদ্ধির অগোচর।

অবিকার্য্য—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগোচর

আত্মা যখন এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত, তখন তজ্জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়। এখানে আত্মার নিত্যত্ব ও অনাত্মার অনিত্যত্ব দেখান হইল।

শ্রীঃ——

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ ৯

সান্বয়ব্যাখ্যা। অশক্তং প্রতি সুগমোপায়মাহ। হে ধনঞ্জয়, অথ (যদি) ময়ি (পরমেশ্বরে) চিত্তং স্থিরং (অচলং) সমাধাতুং (স্থাপয়িতুং ধারয়িতুং) ন শক্নোষি (শক্তো ন ভবসি) ততঃ (পশ্চাৎ) অভ্যাস-যোগেন (বিক্ষিপ্তং চিত্তং পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মদনুস্মরণলক্ষণঃ যঃ অভ্যাসযোগস্তেন) (মনসি নিশ্চলে সতি) মাং (বিশ্বরূপং পরমেশ্বরং) আপ্তুং (প্রাপ্তুং) ইচ্ছ (প্রযত্নং কুরু) ৯

বঙ্গানুবাদ। হে ধনঞ্জয়! যদি আমার এই বিশ্বরূপে স্থিরভাবে চিত্ত স্থাপন করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া ধ্যানরূপ অভ্যাস-যোগ দ্বারা আমাকে পাইতে চেষ্টা কর। ৯

আলোচনা। সগুণব্রহ্মে অনায়াসে চিত্ত স্থির করিতে অসমর্থ ভগবৎ-কামী কি উপায়ে সহজে ভগবৎপ্রাপ্তির পন্থা লাভ করিতে পারেন, ভগবান্ তাহাই বলিতেছেন। হে অর্জ্জুন! যদি আমার বিশ্বরূপে চিত্তে ধারণা করিতে না পার, তাহাহইলে ধ্যানরূপ অভ্যাসযোগ দ্বারা চিত্ত স্থির করিয়া আমাকে পাইতে ইচ্ছাকর। এই অভ্যাসযোগের কথা ভগবান্ ইতঃপূর্ব্বে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৩৫শ শ্লোকে বলিয়াছেন। এ শ্লোকেও প্রসঙ্গাধীন তাহাই বলিতেছেন। আমরা সেই খানেই ইহার বিশেষ আলোচনা করিয়াছি। চিত্তকে সমস্ত বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া কোন একটী অবলম্বনে পুনঃপুনঃ স্থাপনের নাম অভ্যাস। অভ্যাস-পূর্ব্বক যে যোগ বা চিত্তসমাধান তাহার নাম অভ্যাস-যোগ। প্রতিমাদি বাহ্যমূর্ত্তিতে ভগবদ্বুদ্ধি-স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে ভক্তিসহ পূজা ও হৃদয়ে সেইরূপের ধ্যান অভ্যাস করিলে তদ্দ্বারা ভগবজ্জ্ঞান-লাভ হয়। ৯

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্ম-পরমোভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১০

সান্বয়ব্যাখ্যা। অভ্যাসেঽপি অসমর্থঃ অসি (তর্হি) মৎকর্ম্মপরমঃ (মৎপ্রীত্যর্থানি যানি কর্ম্মাণি তদনুষ্ঠানমেব পরমং যস্য তাদৃশঃ) ভব।

মদর্থং (মৎপ্রীত্যর্থং) কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ অপি সিদ্ধিং (সত্ত্বশুদ্ধিং যোগং জ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ ব্রহ্মভাবং) অবাপ্স্যসি (প্রাপ্স্যসি)। ১০

বঙ্গানুবাদ। অভ্যাসেও যদি অসমর্থ হও, তবে আমার প্রীতি জন্য কর্ম্ম-পরায়ণ হও। তাহা হইলে আমাকে লাভ করিতে পারিবে। ১০

আলোচনা। ভগবান্ বলিতেছেন, যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমার প্রীতিজনক কার্য্য কর, তাহাতেও আমাকে লাভ করিতে পারিবে। ভগবান্ আপ্তকাম পূর্ণকাম, তাঁহার কোন কাম নাই, তিনি কিছু চান না, তবে তাঁহার প্রীতিকর কার্য্য কি? "ভগবান্ কিছু চান না সত্য, কিন্তু যে তাঁকে চায়, তিনি তাকে চান।" ভগবান কৃপালু। যে অকপটে মনঃপ্রাণে তদ্গতভাবে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, ভগবান্ তাহাকে কৃপা করেন। তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইলে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। অহংভাবসম্পন্ন কলুষিতচিত্তে তাঁহার কৃপালাভ হয় না। চিত্তকে নির্ম্মল করিবার জন্য—তাঁহার স্বরূপ-দর্শনের জন্য যে কার্য্য, তাহাই তাঁহার প্রীতিকর কার্য্য। ভগবানের মাহাত্ম্য-শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন, তাঁহার বিগ্রহস্থাপন, মন্দির-নির্ম্মাণ, তাঁহার মন্ত্রজপ, ভক্ত-সঙ্গ, অন্তরবাহেন্দ্রিয়সংযম ইত্যাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়—ভক্তির পথ উদ্ভাসিত হয়। ভক্তিমান্ জন ঈশ্বরের প্রিয়, সুতরাং এই সকল কার্য্য তাঁহার প্রিয়কার্য্য মধ্যে পরিগণিত।

ভগবান্ স্বয়ং কর্ম্মশীল। ৩অ ২২ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন—তিনি পূর্ণ-কাম, তাঁহার অপ্রাপ্ত কিছুই নাই, তথাপি তিনি কর্ম্মরত। ঈশ্বরের অভি-প্রায় জানিয়া, তাঁহার যন্ত্রস্বরূপ হইয়া কর্ম্ম করিলে, ঈশ্বরের কর্ম্ম করা হয়। জীবে দয়া, জীবের সেবা—পরিচর্য্যা, জীবের দুঃখভারলাঘবের ও সুখবৃদ্ধির চেষ্টা ও জীবকে সৎপথে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিলে, ঈশ্বরের কর্ম্ম করা হয়। সর্ব্বভূতের সেবাই তাঁহার প্রকৃত সেবা—ইহা জানিয়া, তদনু-সারে কর্ম্ম করিলে ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করা হয়। ইহাই এশ্লোকে "মৎকর্ম্ম" শব্দে বলা হইয়াছে।

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১

সান্বয়ব্যাখ্যা। অত্যন্তং ভগবদ্ধর্ম্মপরিনিষ্ঠায়ামপি অশক্তস্য পক্ষান্তরমাহ। অথ (যদি) এতৎ অপি কর্ত্তুং অশক্তঃ অসি (কর্ত্তুং ন শক্নোষি) ততঃ

(ভব) মদ্‌যোগং (মদেকশরণত্বং) আশ্রিতঃ (আশ্রিতবান্) (সন্) যতাত্মবান্ (সংযতচিত্তঃ) (ভূত্বা) সর্ব্বকর্ম্ম-ফল-ত্যাগং কুরু (সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং যানি ফলানি তেষাং ভগবচ্চরণে সমর্পণং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং) কুরু (ভগবদীশ্বরা-জ্ঞয়া যথাশক্তি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানীতিভাবঃ) ১১

বঙ্গানুবাদ। যদি ভগবৎকর্ম্মানুষ্ঠানেও অসমর্থ হও, তাহা হইলে সংযত-চিত্ত ও আমার শরণাগত হইয়া সর্ব্বকর্ম্মের ফল ঈশ্বরে অর্পণ কর। ১১

আলোচনা। যদি পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে কার্য্য করিতে না পার, তাহা হইলে কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ কর। ভগবান্ সর্ব্বত্র নিষ্কাম-কর্ম্ম-সাধনের প্রশংসা করিয়াছেন। ২অঃ ৪৭। ৪৮। ৫০। ৫১। ৭১ এবং ৩ অ ২০ ও ৪ অ ১৯। ২০ শ্লোকে সকলকামনাবর্জ্জন-পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ৪ অ ৪র্থ, ৫ম ১০ ও ৯ অ ২৭। ২৮ শ্লোকে কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করিতে বলিয়াছেন। (সকাম কর্ম্ম জীবের বন্ধন-স্বরূপ হয়।) যিনি এইরূপে সর্ব্বকর্ম্ম-ফল ত্যাগ করিতে পারেন, তিনি ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইয়া ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম-করিতে সমর্থ হন। তাহাতে সর্ব্বকালে ঈশ্বরের অনুস্মরণ সার্থক হয়। যখন এইরূপে ভক্তিসাধনায় সিদ্ধ হওয়া যায়, তখন সম্পূর্ণ যোগযুক্ততা বা ধ্যানা-ভ্যাসাবস্থা সম্ভব হয়।

শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২

সান্বয়ব্যাখ্যা। অভ্যাসাৎ জ্ঞানং শ্রেয়ঃ (সম্যগ্ জ্ঞান-রহিতাদভ্যাসাৎ যুক্তি-সহিতোপদেশপূর্ব্বকং জ্ঞানং শ্রেয়ঃ) (তস্মাদপি) জ্ঞানাৎ ধ্যানং (জ্ঞান-পূর্ব্বকং ধ্যানং) বিশিষ্যতে, ধ্যানাদপি (জ্ঞানবতো ধ্যানাদপি) কর্ম্মফলত্যাগঃ শ্রেষ্ঠঃ ত্যাগাৎ (আসক্তিনিবৃত্ত্যা মৎপ্রসাদেন) অনন্তরং শান্তিঃ (আত্য-ন্তিকসংসারোপশমঃ) ১২

বঙ্গানুবাদ। সম্যক্‌জ্ঞান-রহিত অভ্যাস অপেক্ষা যুক্তিসহিতোপদেশপূর্ব্বক জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। পরোক্ষজ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞান-পূর্ব্বক ধ্যান শ্রেষ্ঠ। ধ্যান অপেক্ষা বিচারপূর্ব্বক কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ। ত্যাগের পর আসক্তি নিবৃত্ত হওয়ায় শান্তিলাভ হয়। ১২

আলোচনা। ভগবান্ ৬।৭ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, যাহারা ধ্যাননিরত হইয়া আমার উপাসনা করে, আমি তাহাদের মৃত্যুযুক্ত সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি। ৮ম শ্লোকে বলিয়াছেন যে, অতএব আমাতে মন স্থাপন কর,

আমাতে বুদ্ধি নিবেশ কর—অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বক আমার উপাসনা কর। ৯ম শ্লোকে বলিয়াছেন, যদি আমাতে চিত্ত স্থাপন করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে অভ্যাসযোগ অর্থাৎ পুনঃপুনঃ অনুশীলন দ্বারা আমাকে পাইতে চেষ্টা কর। ১০ম শ্লোকে বলিয়াছেন—যদি তাহাও না পার, তাহা হইলে আমার প্রীতিসাধনার্থ কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান কর। ১১শ শ্লোকে বলিলেন—যদি তাহাতেও অশক্ত হও, তাহা হইলে সংযতচিত্তে মৎশরণাপন্ন হইয়া ফলাসক্তি-ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম কর। এই শ্লোকে বলিয়াছেন,—তোমাকে যে অভ্যাস, জ্ঞান, ধ্যান ও কর্ম্মফলত্যাগের কথা বলিলাম, তাহার মধ্যে অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ উত্তম। কর্ম্মফল-ত্যাগ করিলে আশক্তি-নিবৃত্তি-হেতু শান্তি অর্থাৎ মুক্তিলাভ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অভ্যাস—মনে কোন বিষয়কে পুনঃপুনঃ যত্ন দ্বারা আয়ত্ত করা, কণ্ঠস্থ করা বা মুখস্থ করা। যাহা অভ্যাস করিতে হয়, তাহা বুঝিয়া করাই ভাল। অনেক সময় না বুঝিয়াও চেষ্টা দ্বারা অভ্যাস করা যায়। তাদৃশ অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান ভাল, এই জন্য অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। আবার মনন চিন্তন বা ধ্যান দ্বারা জ্ঞানের পরিমার্জ্জন হয়, এজন্য জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যানকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ধ্যানের বিচ্ছেদে মনকে বাহ্য বিষয়ে লিপ্ত হইতে হয়, কিন্তু যিনি সংযতচেতা, আমি ঈশ্বরের নিয়োগানুসারে তাঁহার দাসভাবে যথাশক্তি কার্য্য করিতেছি, দৃষ্ট অদৃষ্ট যাহা কিছু ফল সমস্তই ঈশ্বরাধীন—এইরূপ ভাবে ফলাসক্তিপরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া কার্য্য করেন, তিনি অচিরাৎ অহংভাববর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বকার্য্যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব দর্শন করেন ও আপন অস্তিত্ব ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া শান্তি-লাভের অধিকারী হন। এই জন্যই ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগের প্রাধান্য কথিত হইয়াছে। ১২

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃক্ষমী॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪

সান্বয়ব্যাখ্যা। সর্ব্বভূতানাং অদ্বেষ্টা (সর্ব্বেষাং ভূতানাং ন দ্বেষ্টা) মৈত্রঃ (মিত্রভাবাপন্নঃ) করুণঃ (কৃপালুঃ) এব নির্ম্মমঃ (মমেতি প্রত্যয়-বির্জ্জিতঃ) নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ (সমে সুখদুঃখে যস্য সঃ) ক্ষমী

(ক্ষমাশীলঃ) সততং (নিত্যং) সন্তুষ্টঃ (সুপ্রসন্নচিত্তঃ) যোগী (অপ্রমত্তঃ) যতাত্মা (সংযতস্বভাবঃ) দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (স্থিতপ্রজ্ঞঃ) ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (এবম্ভূতঃ) যঃ মদ্ভক্তঃ (মদ্ ভজনপরঃ) স মে (মম) প্রিয়ঃ। ১৩। ১৪

বঙ্গানুবাদ। যিনি সর্ব্বভূতের প্রতি দ্বেষরহিত, মিত্রভাবাপন্ন, দয়াবান্, মমতাহীন, অহঙ্কারশূন্য, সুখ দুঃখে যাঁহার সমানভাব, যিনি ক্ষমাশীল ও সর্ব্বদা সন্তুষ্ট এবং সমাহিতচিত্ত, সংযতস্বভাব, স্থিতপ্রজ্ঞ, যাঁহার মন বুদ্ধি আমাতেই অর্পিত, ঈদৃশ মদ্ভক্তই আমার প্রিয়। ১৩। ১৪

আলোচনা। ভগবান্ ৫ম শ্লোকে নির্গুণব্রহ্মোপাসকের উপাসনার কৃচ্ছ্র-তরতার উল্লেখ করিয়াছেন। ৬ষ্ঠ হইতে ১১শ শ্লোক পর্য্যন্ত সগুণসাকারো-পাসকের উপাসনাপ্রণালী ও তাহাদের মধ্যে অধিকারিভেদে কে কি প্রকারে উপাসনা করিলে ভগবানের কৃপালাভ করিতে পারেন, তাহাও বলিয়াছেন। ইহাতে কেহ বুঝিবেন না যে, ইহার মধ্যে ভগবানের চক্ষে একটী ভাল, আর অপরটী মন্দ প্রতীত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে অধিকারি-ভেদে সুগম ও কঠিন সাধন-প্রণালী কথিত হইতেছে মাত্র। সগুণ নির্গুণ সকলই তিনি। উপাসক কি রকম প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে ভগবানের প্রিয়তা লাভ করিতে পারেন, ভগবান্ এক্ষণে তাহাই বলিতেছেন। যিনি অদ্বেষ্টা অর্থাৎ যিনি আত্মপর শত্রু মিত্র কাহাকেও দ্বেষ করেন না, কেহ অপকার করিলে "অপকারী যেন ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়াই তাঁহার অপকার করিতেছে, আর তিনিও প্রারব্ধ ফল ভোগ করিতেছেন" এই ধারণা করিয়া দ্বেষহীন হন; যিনি সকলের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন, সকল প্রাণীতে করুণাযুক্ত, মমতাহীন অর্থাৎ আপন দেহপুত্র-কলত্র-ধনাদিতে নশ্বর-বোধে মমত্ব করেন না; যিনি নিরহঙ্কার অর্থাৎ "সকলই ঈশ্বর কৃত, আমি কর্ত্তা নহি," এই ভাবযুক্ত; যিনি সমদুঃখসুখ—সুখে হর্ষ ও দুঃখে উদ্বেগ-রহিত, যিনি ক্ষমাশীল অর্থাৎ শক্তিসত্ত্বেও ক্লেশদাতার প্রতি অবিরক্ত, নিত্য সন্তুষ্ট, ভগবানে সমাহিতচিত্ত, যাঁহার শরীর বাক্য ইন্দ্রিয়াদি সংযত, যিনি স্থিরবিশ্বাসী, যাঁহার মন বুদ্ধি প্রভৃতি ঈশ্বরে অর্পিত, ঈদৃশ ভক্ত ভগবানের প্রিয়তা লাভ করেন। ১৩। ১৪

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫

সাম্বয়ব্যাখ্যা। যস্মাৎ লোকঃ ন উদ্বিজতে (ন উদ্বেগং গচ্ছতি) যশ্চ লোকাৎ ন উদ্বিজতে (ভয়শঙ্কয়া সঙ্কোচং ন প্রাপ্নোতি) যশ্চ (স্বাভাবিকৈঃ)

হর্ষামর্ষ-ভয়োদ্বেগৈঃ (হর্ষঃ স্বস্য ইষ্টলাভে উৎসাহঃ অমর্ষঃ পরস্য লাভে অসহনং ভয়ং ত্রাস উদ্বেগঃ ভয়াদিনিমিত্তশ্চিত্তক্ষোভ এতৈঃ) মুক্তঃ সচঃ মে প্রিয়ঃ। ১৫

বঙ্গানুবাদ। যাহা দ্বারা কোন লোক উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না আর যিনি নিজেও কাহার দ্বারা উদ্বেগ পাননা এবং যিনি পরশ্রীকাতরতা, ভয় ও উদ্বেগ-শূন্য, তিনি আমার প্রিয়। ১৫

আলোচনা। যিনি নিজে শরীর মন বা কথা দ্বারা কোন প্রাণীকে ব্যথা দেন না এবং অন্য প্রাণীও যাহার কোন প্রকার উদ্বেগের কারণ হয় না, এরূপ ভক্ত ভগবানের প্রিয়। নিজে কাহাকেও পীড়া না দিয়া পারা যায়, কিন্তু অপরে কোন কারণে আমাকে দুঃখ দিবে না—ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? এ তর্কের উত্তরে বলা যায়, যিনি সমস্ত জীবকে আত্মবৎ-বোধে সকলের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার করেন, কোন জীব তাঁহার ক্ষতি করে না। প্রেমের বলে বনের পশুপক্ষীও দ্বেষ হিংসা ত্যাগ করিয়া বশীভূত হয়। ধ্রুব, ব্যাঘ্রকে হরি-বোধে আহ্বান করিয়াছিলেন। তপোবনে মুনি ঋষিদিগের আশ্রমে হিংস্রজন্তুগণ পরস্পর হিংসাবৃত্তি ভুলিয়া আত্মীয়বৎ ব্যবহার করে, ইহা অনেক শুনা গিয়াছে। জগৎ প্রেমের বশ, তাহার সন্দেহ নাই, তবে এই প্রেম বিশুদ্ধস্ফটিকবৎ নির্ম্মল হওয়া চাই। যিনি ঈদৃশ প্রেমিক এবং পরশ্রীকাতরতা ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তাদৃশ ভক্তই ভগবানের প্রিয়তা লাভ করেন। ১৫

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬

সান্বয়ব্যাখ্যা। অনপেক্ষঃ (নিস্পৃহঃ) শুচিঃ (বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ) দক্ষঃ (অনলসঃ পটুঃ) উদাসীনঃ (পক্ষপাতরহিতঃ) গতব্যথঃ (আধিশূন্যঃ মনঃপীড়াশূন্যঃ) সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সকামকর্ম্মানুষ্ঠানস্পৃহাশূন্যঃ) যঃ মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। ১৬

বঙ্গানুবাদ। যিনি বিষয়ে নিস্পৃহ, শৌচসম্পন্ন, অনলস, দুঃখে অব্যথিত-চিত্ত, কর্ম্মানুষ্ঠানে ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত, তাদৃশ ভক্ত আমার প্রিয়। ১৬

আলোচনা। অযত্নলব্ধ বস্তুতেও যাঁহার স্পৃহা নাই, যিনি বাহ্যাভ্যন্তরশুচিত্ব-যুক্ত, কর্ত্তব্য কর্ম্মে যিনি পটু, যিনি পক্ষপাতশূন্য, মানাপমানে সমচিত্ত, যিনি শীতোষ্ণাদি দুঃখে বা পর কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়াও ব্যথারহিত, ঐহিক পারত্রিক ফলকামনায় যিনি কোন কার্য্য আরম্ভ করেন না, ঈদৃশ ভক্ত ভগবানের প্রিয় হন। ১৬

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত।

ব্রহ্মসূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(দ্বিতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয়পাদ)

১। রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্।

২। প্রবৃত্তেশ্চ।

৩। পয়োঽম্বুবচ্চেত্তত্রাপি।

৪। ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ।

৫। অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ।

৬। অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ।

৭। পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি।

৮। অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ।

৯। অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ।

১০। বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্।

পদপাঠ ও বঙ্গানুবাদ।

১। রচনা—অনুপপত্তে:—চ—ন—অনুমানম্—

রচনার অনুপপত্তিহেতু ও অন্যান্য কারণে অনুমান করা যায় না—অর্থাৎ সাঙ্খ্যবাদীরা "প্রধান"কেই যে জগতের কারণ বলিয়া অনুমান করেন, সে অনুমান চলিতে পারেনা। কেননা 'প্রধান' হইতে জগতের এই রচনা বা সুশৃঙ্খল বিচিত্র-বিন্যাস সম্ভব হইতে পারেনা। অন্যান্য কারণেও ঐরূপ অনুমান করা অসম্ভব।

২। প্রবৃত্তে:—চ।

প্রবৃত্তির অসম্ভাবনাহেতু "প্রধান"কে জগতের কারণ বলিয়া অনুমান করা যায় না।

৩। পয়:—অম্বুবৎ—চেৎ—তত্র—অপি—

যদি পয়: ও অম্বুর দৃষ্টান্ত দেখান হয়, তবে বলিব, সেখানেও চেতনের নিমিত্ততা আছে।

৪। ব্যতিরেক-অনবস্থিতে:—চ—অনপেক্ষত্বাৎ—

প্রধানের স্বীয় সাম্যাবস্থা ব্যতিরেকে নিয়ন্তা আর কিছু না থাকায় জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়ে তাহার অপেক্ষা নাই।

৫। অন্যত্র—অভাবাৎ—চ—তৃণাদিবৎ

তৃণাদি যেমন দুগ্ধে পরিণত হয়, প্রধান সেরূপ জগদাকারে পরিণত হইতে পারেনা, কারণ অন্যত্র তাহার অভাব দেখা যায়—অর্থাৎ যে তৃণ গাভী কর্ত্তৃক ভক্ষিত না হয় তাহা দুগ্ধে পরিণত হয় না।

৬। অভ্যুপগমে—অপি—অর্থ-অভাবাৎ—

প্রধানের স্বতঃ প্রবৃত্তি স্বীকার করিলেও দোষের পরিহার হয় না, কারণ তাহাতে পুরুষার্থের অভাব ঘটে।

৭। পুরুষ-অশ্মবৎ—ইতি—চেৎ—তথা—অপি—

যদি পুরুষের এবং পাষাণের দৃষ্টান্ত দেখাও, তাহাতেও দোষপরিহার ঘটে না।

৮। অঙ্গিত্ব—অনুপপত্তেঃ—চ—

ত্রিগুণের অঙ্গিত্ব না থাকায় সৃষ্টিরই অনুপপত্তি হয়।

৯। অন্যথা—অনুমিতৌ—চ—জ্ঞ-শক্তিবিয়োগাৎ—

অন্যপ্রকার অনুমান করিলে অর্থাৎ গুণগণের অঙ্গিত্ব স্বীকার করিলেও প্রধানের জ্ঞানশক্তির অভাবে তাহা হইতে জগৎ রচিত হওয়া অসম্ভব।

১০। বিপ্রতিষেধাৎ—চ—অসমঞ্জসম্—

বিভিন্নপ্রকার বিরোধহেতু সাংখ্যমত সামঞ্জস্যবিহীন।

এই দশটী সূত্রে একটী অধিকরণ গঠিত।

দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের সাধারণ উদ্দেশ্য।

এই পাদে যুক্তিসিদ্ধ সাংখ্যমতের নিরাকরণ করা হইতেছে।

অনেকে মনে করিতে পারেন, বেদান্তে সাংখ্যমতের খণ্ডনের প্রয়োজন কি? আর যদি প্রয়োজনই থাকে, তাহাও নিষ্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং এখানে পুনর্ব্বার খণ্ডনের কারণ কি?

বেদান্তবাদী প্রত্যুত্তরে বলেন—সাংখ্যমত-নিরাসের বিশেষ প্রয়োজন আছে। সাংখ্যদর্শন, সিদ্ধ মহাত্মা কপিল কর্ত্তৃক প্রণীত বলিয়া সাধারণের মধ্যে সমাদৃত, অনেকে সাংখ্যদর্শনকে যথার্থদর্শন বা সম্যগ্‌দর্শন বলিয়া মনেও করেন, সুতরাং তাহার ভ্রমপ্রদর্শন একান্তকর্ত্তব্য। সাংখ্যমত যে মোক্ষার্থিগণের নিকট আদৃত হইতে পারেনা, তাহা এস্থলে দেখান দরকার। প্রথমাধ্যায়ে সাংখ্যরূপনিরাস করা হইয়াছে, কিন্তু সাংখ্যমতাবলম্বিদের উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যসকল যে তাঁহাদের অভিমতসাধনে সমর্থ নয়, তাহাই সেখানে দেখান হইয়াছে।

এ পাদে সাংখ্যসম্প্রদায়ের যুক্তিতর্কও যে তাঁহাদের অভিলাষসিদ্ধির অনুকূল নহে, তাহাই দেখান হইতেছে; সুতরাং ইহার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। পূর্ব্বে যে সাংখ্যমত-খণ্ডন করা হইয়াছে, তাহা প্রধানভাবে নহে, গৌণভাবে। পূর্ব্বে বেদান্তমতস্থাপনের জন্য প্রাসঙ্গিকভাবে সাংখ্যমত-খণ্ডন করা হইয়াছে, এখানে প্রধানভাবেই সাংখ্যমতখণ্ডন করা হইতেছে

বিশদব্যাখ্যা।

প্রথমসূত্রে বলা হইতেছে—সাংখ্যদর্শনের প্রধান-কারণবাদ অযুক্ত, কারণ প্রধানের অনুমান সঙ্গত নহে। সাংখ্যমতে প্রধানই জগতের কারণ। তাঁহারা বলেন—যেমন ঘট শরাব প্রভৃতি মৃত্তিকাজাত সর্ব্বপদার্থে মৃত্তিকার সাধারণগুণ আছে বলিয়া মৃত্তিকাকেই ঘটশরাবাদির কারণ বলিয়া নির্ণয় করা সঙ্গত, তদ্রূপ সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক বা সুখ-দুঃখমোহাত্মক সমস্ত জগতের কারণরূপে সুখ-দুঃখমোহাত্মক প্রধানকেই অনুমান করা সঙ্গত। সাংখ্যবাদীরা বলেন—পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্য প্রধান বা প্রকৃতি বিভিন্ন আকার ধারণ করেন। ইহার বিরুদ্ধে বেদান্তবাদীরা বলেন যে, ঐরূপ দৃষ্টান্ত আমরা জগতে দেখিতে পাই না। সাংখ্যবাদীরা মৃত্তিকার ঘটশরাবাদি-পরিণতি সম্বন্ধে যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা ভুল, কারণ অচেতন মৃত্তিকা, চেতন কুম্ভকারের সহায়তা ব্যতীত ঐ সকল আকার ধারণ করিতে পারেনা। বিচিত্রজগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সকলেরই হৃদয়ে বিস্ময়ের উদয় হয়। প্রজ্ঞাবান্ শিল্পীরাও কিরূপে এই বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারেন না। সুতরাং এই রচনাকৌশলময় বিচিত্রজগৎ যে অচেতন প্রধান কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত। সূত্রস্থ 'চ' শব্দের দ্বারা অন্য যে হেতুর কথা বলা হইতেছে—তাহা এই। সাংখ্যবাদীরা যে জড়জগৎকে সুখ-দুঃখমোহাত্মক বলেন, তাহাও সঙ্গত হয় না; কারণ একই বস্তু কাহারও পক্ষে সুখদায়ক, কাহারও পক্ষে দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। জড়বস্তু নিরপেক্ষভাবে সুখকর বা দুঃখকর নহে, মানসিকভাবের সহিত সংযুক্ত হইয়াই সুখকর বা দুঃখকর হইয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে, জড়-জগৎ যখন সুখদুঃখমোহাত্মক নয়, সুখদুঃখমোহ যখন জড় হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ, তখন জড়জগৎকে সুখদুঃখমোহাত্মক মনে করিয়া লইয়া তাহার কারণরূপে সুখদুঃখমোহাত্মক প্রধানের অনুমান করা একেবারেই অসম্ভব। 'চ'শব্দের দ্বারা সাংখীয় অনুমানে 'হেত্বসিদ্ধি' দোষ উদ্ভাবন করা হইতেছে, লক্ষ্য করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য।

বাঙ্গালার কৃতী সন্তান। সপ্তদশবর্ষীয় বাঙ্গালী যুবক শ্রীমান্ ই দত্ত কিছুকাল পূর্ব্বে মধ্যপ্রদেশে থাকিয়া রাসায়ণিক-প্রক্রিয়ায় জলাভূমির গ্যাস্ (Marsh Gash) প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনি ঐ গ্যাসের পেটেণ্ট লইয়াছেন। শ্রীমান্ এখন জিপসাম্ সলফেট্ অব্ লাইম্ হইতে গন্ধক প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কারজন্য বম্বে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীমান্ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী নহেন, কলেজে শিক্ষালাভও করেন নাই, তিনি ভগবদ্দত্ত-প্রতিভাসম্পদে ধনী। তাঁহার সাফল্য কামনা করি।

শোকসংবাদ। প্রথিতনামা মনোরঞ্জনগুহঠাকুরতা মহাশয় সম্প্রতি তনুত্যাগ করিয়া কর্ম্মজিতলোকে গমন করিয়াছেন। ঠাকুরতা মহাশয়ের জীবন নানা-বৈচিত্র্যপূর্ণ। ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রথমজীবনে তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম, শেষে হইয়াছিলেন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রতি তাঁহার অত্যধিক অনুরাগ ছিল। ঠাকুরতামহাশয় স্বদেশপ্রাণ লোক ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে বহু শিক্ষণীয় সদ্‌গুণ ছিল। তাঁহার অভাব দুঃখজনকই বটে।

যুদ্ধযাত্রা। শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ বসু আফ্‌গানরণে যাইবার অনুমতি পাইয়াছেন। শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ বেলুচস্থানেই স্বীয় রণকৌশলের পরিচয় দিবার অবকাশ পাইবেন।

সংবাদপত্র-পরিচালকের দণ্ড। "কাথিয়াবাড় সমাচার"নামক সমাচারপত্রের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী দশবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। চিন্তার কথা।

সুখের কথা। ময়মনসিংহের ধনগোড়াগ্রামবাসী শ্রীযুত সত্যরঞ্জন মজুমদার মহাশয় একটী বাঙ্গালা টাইপ্‌রাইটার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু এখনও ঐ যন্ত্র পূর্ণতালাভ করে নাই। আরও কিছু সংস্কার সাধিত হইলে ঐ যন্ত্রের দ্বারা বহুল উপকার পাওয়া যাইবে। সত্যরঞ্জন বাবুর উদ্যম সফল হউক্।

---

২৬ বর্ষ। কার্ত্তিক। ৭ম সংখ্যা।

হিন্দু-পত্রিকা।

WITH WHICH IS INCORPORATED "THE BRAHMACHARIN."

(ধর্ম্ম-সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি-বিষয়ক
মাসিক-পত্রিকা।)

সম্পাদক

বেদান্তবাচস্পতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম, এ, বি, এল,

সহকারি-সম্পাদক

স্মৃতিসাংখ্যমীমাংসাতীর্থ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী।

যশোহর

হিন্দু-পত্রিকা-প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ইং—১২ই নবেম্বর ১৯১৯।

বাং—২৬শে কার্ত্তিক ১৩২৬।

শকাব্দাঃ ১৮৪১।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—সমেত ডাকমাশুল ২৲ মাত্র, এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵ আনা

সূচী।

বর্ত্তমানসংখ্যার লেখকগণের নাম।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিভূষণ, শ্রী——, শ্রী—— শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, শ্রীদুর্গাচরণ দাশগুপ্ত, শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র, শ্রীআশুনাথ কাব্যতীর্থ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-বিশারদ, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক প্রভৃতি।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টরীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২৬ বর্ষ, ২৬শ খণ্ড
৭ম সংখ্যা।

কার্ত্তিক।

১৩২৬ সাল।
১৮৪১ শকাব্দ।

শরণ্য।

জগতে তব প্রেম রহিত হ'য়ে যারা,
দম্ভ অভিমানে সতত মাতোয়ারা,
প্রেমআঁখি-ঠারে, ডাকিছ তবু তারে
সুপথ দেখাইতে সেজেছ ধ্রুবতারা!
ভুলেও যদি নরে, ভুলনা তুমি তারে,
জীবন-দীপরূপে অন্তরে আছ খাড়া!
মোহ-দুর্বিপাকে যে তোমা নাহি ডাকে,
উজলি তবু তার র'য়েছ দেহকারা!
চেতন কিবা জড়, কেহ না তব পর,
পারে না তৃণগাছি তিষ্ঠিতে তোমা ছাড়া!
সৈকত শৈলসিন্ধু, তপন তারা ইন্দু,
গহনে কাননে, কোথা না পাই সাড়া?
র'য়েছ ভূমে জলে, র'য়েছ ফুলে ফলে
নীল নভতলে, হইয়ে সীমাহারা!

প্রভাত মৃদুবাতে, জলদে ঝঞ্ঝাঘাতে,
সকল অবস্থাতে বহিছে প্রেমধারা।
শরণ না ল'য়ে, নিখিল নিলয়ে,
ওগো প্রেমময়, কেমনে যাবে পারা?

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিভূষণ।

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

(প্রথম অষ্টক—চতুর্থঅধ্যায় ষষ্ঠবর্গ—প্রথমমণ্ডল—৯অ-৪৯ সূক্ত).

উষো ভদ্রেভিরাগহি দিবশ্চিদ্রোচনাদধি।
বহন্ত্বরুণপ্সব উপত্বা সোমিনো গৃহম্॥ ১

পদপাঠঃ। উষঃ—ভদ্রেভিঃ—আগহি—দিবঃ—চিৎ—রোচনাৎ—অধি—বহন্তু—অরুণপ্সবঃ—উপ—ত্বা—সোমিনঃ—গৃহম্।

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে উষঃ (উষোদেবতে!) ভদ্রেভিঃ (শোভনৈঃ মার্গৈঃ) রোচনাৎ (দীপ্যমানাৎ) চিৎ (পূজিতাৎ) অধি (উপরিবর্ত্তমানাৎ) দিবঃ (অন্তরিক্ষলোকাৎ) আগহি (আগচ্ছ) অরুণপ্সবঃ (অরুণবর্ণা গাবঃ) সোমিনঃ (সোমযুক্তস্য যজমানস্য) গৃহং (যজ্ঞস্থানং) ত্বা (ত্বাম্) উপবহন্তু (প্রাপয়ন্তু)

বঙ্গার্থ। হে ঊষা! শোভন (মার্গ) দ্বারা উপরিস্থিত দীপ্যমান পূজিত দ্যুলোক হইতে আগমন কর। অরুণবর্ণ গোগণ, সোমযুক্ত যজমানের গৃহে তোমাকে বহন করিয়া আনয়ন করুক্।

আলোচনা। ঊর্দ্ধবর্ত্তী অন্তরিক্ষলোক হইতে দীপ্তিময়ী উষার আগমন প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করা যায়। অরুণবর্ণ গোগণ—অরুণ-কিরণসমূহ; তাহারাই যজমানগৃহে অনাবৃতস্থলে স্থাপিত সোমরস-পাত্রের নিকট উষাকে বহন করিয়া আনে। 'অরুণপ্সবঃ' সায়ণের মতে "অরুণবর্ণাঃ গাবঃ।" বস্তুতঃ কিন্তু গাভীরা উষাকে বহন করিয়া আনে না; সেজন্য কেহ ২ সূর্য্যকিরণসমূহকে অথবা সূর্য্যকিরণ-রঞ্জিত মেঘসকলকে 'গো' শব্দে বুঝিয়াছেন। গো' অর্থ কিরণ প্রসিদ্ধ, কিন্তু 'মেঘখণ্ড' অর্থে 'গো'শব্দের ব্যবহার বিরল। সায়ণ

যে 'গো' অর্থ করিয়াছেন, তাহাও মনঃকল্পিত। কারণ তিনি লিখিয়াছেন "গা ভক্ষণে, গাবি ভক্ষয়ন্তি স্তনং পিবন্তীতি গাবোবৎসাঃ। + + অরুণাঃ গাবোযাসাং তাঃ তথোক্তাঃ"—এই অরুণবর্ণ বৎস যাহাদের, সেই গাভীরা অরুণগাবঃ। যাহারা ভক্ষণ করে তাহারা বৎস হইবে—এরূপ নিয়ম দেখা যায় না। কিরণসমূহই রসশোষণ করে, বহিঃস্থিত উন্মুক্ত পাত্র হইতে সোমরস ভক্ষণ করে, সুতরাং তাহারাই গাবঃ—তাহারা যে 'অরুণাঃ' তাহা ত প্রত্যক্ষ। এই সরল অর্থের মধ্যে রূপকের অবতারণা ব্যর্থ। আর রঞ্জিত মেঘখণ্ড যে উষাকে যজমানের গৃহে বহন করিয়া আনে—এরূপ উক্তির মূল্য নাই। মেঘস্তরের পর দিয়া—ভিতর দিয়া উষার আলোক আসিতে পারে, কিন্তু মেঘখণ্ড যজমান গৃহে পৌঁছাইয়া দেয়—এ ঘটনা প্রত্যহ ঘটে না বা ঘটিতে পারে না। সুতরাং ইহাও অতিকল্পনামূলক। কাজেই এ শ্রেণীর ব্যাখ্যা সাবধানে গ্রহণ করা উচিত। এ প্রসঙ্গে ইহাও আলোচ্য যে, সায়ণের "অত্র বৎসানামারুণ্য-প্রতিপাদনাৎ মাতৄণামপি তথাত্বং গম্যতে" অর্থাৎ বৎসগণকে অরুণবর্ণ বলায়, বৎসের মাতা গাভীরাও অরুণবর্ণা বুঝিতে হইবে।—এরূপ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া অনেকের পক্ষেই স্বাভাবিক। "ভদ্রেভিঃ" অর্থ "শোভনৈঃ মার্গৈঃ" সায়ণের মত। 'ভদ্র' শব্দের কল্যাণ অর্থ প্রসিদ্ধ। ভদ্রৈঃ কল্যাণৈঃ সহ আগচ্ছ—মঙ্গলের সহিত আগমন কর অর্থও হইতে পারে। 'ভদ্র' অর্থ সূর্য্য-কিরণও হইতে পারে। সূর্য্য-কিরণ সমূহ তোমাকে যজমানের গৃহে বহন করিয়া লইয়া আসুক, তুমি তাহাদের সহিত আগমন কর—এরূপ অর্থও কেহ কেহ করেন। "আগহি" শব্দ শুনিলেই মনে হয় পূর্ববঙ্গের "আগোও" এবং পশ্চিমবঙ্গের 'এগোও'। তখন মনে হয়—ছান্দস-ভাষার সহিত বঙ্গভাষার সম্বন্ধ সত্য।

সুপেশসং সুখং রথং যমধ্যস্থা উষস্ত্বম্।
তেনা সুশ্রবসং জনং প্রাবাদ্য দুহিতর্দিবঃ ॥ ২

পদপাঠঃ। সুপেশসং—সুখং—রথং—যং—অধ্যস্থাঃ—উষঃ—ত্বম্—তেন—সুশ্রবসং—জনম্—প্র—অব—অদ্য—দুহিতঃ—দিবঃ।

সায়নব্যাখ্যা। হে উষঃ (উষঃকালাদেবতে!) (ত্বং) যং সুপেশসং (শোভনরূপং শোভনহিরণ্যযুক্তং) সুখং (শোভনেন খেন গগনেন যুক্তং, বিস্তৃত মিত্যর্থঃ, সুখহেতুং বা) রথং অধ্যস্থাঃ (অধিতিষ্ঠসি) তেন (রথেন) অদ্য (অস্মিন্‌কালে) হে দিবোদুহিতঃ। (দ্যুলোকাদুৎপন্নে উষোদেবতে!) সুশ্রবসং (শোভনহবির্যুক্তং) জনং (যজমানং) প্রাব (প্রকর্ষেণগচ্ছ, রক্ষ বা)

বঙ্গার্থ। হে উষা! তুমি যে সুরূপ সুখকর রথে আরোহণ কর, হে দ্যুলোকদেবতার দুহিতা! সেই রথের দ্বারাই এক্ষণে শোভনহবির্যুক্ত যজমানের নিকট গমন কর (অথবা উত্তমযশঃশালী জনকে রক্ষা কর।)

আলোচনা। উষার এই রথ যে কিরণময়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। উষা দ্যুলোক হইতে ঐ রথে চড়িয়াই যজমানের বাটীতে আসিয়া থাকেন। সায়ণাচার্য্যও রথের বিশেষণগুলির ব্যাখ্যায় সে কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। 'সুপেশসং' কথার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি যাস্কমতের অনুসরণ করিয়া দুইটী অর্থ লিখিয়াছেন। 'পেশ' শব্দের 'রূপ' এবং 'হিরণ্য বা স্বর্ণ' এই দুই অর্থ গ্রহণ করিয়া তিনি শোভনরূপং ও শোভনহিরণ্যযুক্তং লিখিয়াছেন। দুইটী কথার মধ্যেই সত্য নিহিত আছে। সূর্য্যরশ্মি যে রূপসম্পদের উৎস, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, আর রশ্মিতে হিরণ্য বা স্বর্ণ বিদ্যমান আছে—তাহা সূর্য্যরশ্মিতে তেজোরূপে বিদ্যমান স্বর্ণরেণুর অস্তিত্ব অবগত হইলেই বলা যায়। মহামতি যাস্ক বোধ হয় বৈদিক ঋষিগণের সূর্য্যকিরণে বিদ্যমান ধাতবপদার্থের জ্ঞানের কথা শুনিয়াছিলেন। 'সুখ'—শব্দের ব্যাখ্যায় সায়ণ বলিয়াছেন "শোভনেন খেন আকাশেন যুক্তং" শোভন আকাশে বিদ্যমান বা শোভন আকাশের সহিত যুক্ত হওয়া সূর্য্যরশ্মির পক্ষেই সহজ সম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। সায়ণ কিন্তু ঐরূপ ব্যাখ্যা দিয়াও "বিস্তৃতমিত্যর্থঃ" লিখিয়া সব অস্পষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। 'সুশ্রবসং জনং' বলিতে যে "শোভনহবির্যুক্ত যজমান" বুঝিতে হইবে, তাহার কারণ নাই। "শ্রবঃ" যশোবাচী। উত্তমযশঃসম্পন্ন জন বা লোককে রক্ষা কর—অর্থ করিলেই চলে, তবে যাজ্ঞিক-প্রস্থান-ব্যাখ্যাতা সায়ণ সর্ব্বত্র যজমানের কথাই বুঝিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। উষা যজমান ভিন্ন অপরের বাটীতেও যান, অপরকেও অন্ধকার ও দস্যু তস্করাদি হইতে রক্ষা করেন। মহাশক্তি উষা, সাধন-সম্পন্নগণকে রক্ষা করেন, সুকৃতকারিগণের নিকট গমন করেন বা প্রকাশিত হন—ইহাও সত্য।

বয়শ্চিত্তে পতত্রিণো দ্বিপচ্চতুষ্পদর্জ্জুনি।
উষঃ প্রারন্নৃতূঁরনু দিবো অন্তেভ্যস্পরি॥ ৩

পদপাঠঃ। বয়ঃ—চিৎ—তে—পতত্রিণঃ—দ্বিপৎ—চতুষ্পৎ—অর্জ্জুনি—উষঃ—প্র—আরন্—ঋতূন্—অনু—দিবঃ—অন্তেভ্যঃ—পরি।

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে অর্জ্জুনি! (শুভ্রবর্ণে!) উষঃ (উষোদেবতে! দ্বিপৎ (দ্বিপাৎ মনুষ্যাদিকং) চতুষ্পাৎ (গবাদিকং) (তথা) পতত্রিণঃ (পক্ষযুক্তাঃ)

বয়ঃচিৎ (পক্ষিণশ্চ) দিবঃ (দ্যুলোকস্য) অন্তেভ্যঃ (প্রান্তেভ্যঃ) পরি (উপরি) তে (তব) ঋতূঁ অনু (ঋতূন্ গমনানি অনুলক্ষ্য) প্রারন্ (প্রকর্ষেণ গচ্ছন্তি, রাত্রাবন্ধকারেণাভিভূতাঃ সর্ব্বে প্রাণিনঃ ত্বদাগমনানন্তরং চেষ্টাবন্তো ভবন্তীত্যর্থ ইতি সায়ণঃ ।)

বঙ্গার্থ। হে অর্জ্জুনি উষা! দ্যুলোকের অন্তভাগের উপরে তোমার গমন লক্ষ্য করিয়া দ্বিপদগণ চতুষ্পাদগণ ও পক্ষযুক্ত পাক্ষিগণ প্রকৃষ্টরূপে গমন করে।

আলোচনা। উষার আগমন লক্ষ্য করিয়া মনুষ্যাদি দ্বিপদ জীবগণ, গো অশ্ব প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তুগণ এবং পক্ষযুক্ত পক্ষী ও পতঙ্গাদি প্রাণিগণ প্রকৃষ্টরূপে গমন করে, ইহা উষার মহিমার পরিচায়ক। নৈশ অন্ধকারে মানব পশুপক্ষী কেহই প্রকৃষ্টরূপে গমন করিতে সমর্থ হয় না, কায়ক্লেশে অল্পমাত্রায় গমন করে, কিন্তু উষার আলোক দর্শন মাত্রেই তাহারা নবীন উদ্যমে গমনাগমন করিতে থাকে। এখানে বলা হইতেছে, উষাদেবী সমস্ত জীবজগৎকে আলস্য বা জড়তার রাজ্য হইতে গতির বা কর্ম্মের রাজ্যে লইয়া যান। স্রষ্টৃশক্তি উষা, প্রলয়নিলীন জীবগণকে (মনুষ্য গো অশ্ব পক্ষি প্রভৃতিকে) কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করেন, সৃষ্টি—কর্ম্মের নূতন ব্যবস্থা করিয়া দেন—নিরোধ বা তমোময় ভাবের মধ্যে সুপ্ত গুপ্ত লুপ্তপ্রায় কর্ম্মশক্তিকে জাগাইয়া তোলেন—নবীন কর্ম্মক্ষম উপকরণ ও আবেষ্টন জুটাইয়া দিয়া নিবৃত্তিমুখ ক্ষীণাতিক্ষীণ কর্ম্মস্রোতঃ সঞ্চারিত করিয়া জগদ্‌রচনার উদ্দেশ্য সফল করিতে চেষ্টা করেন। উষার প্রকৃত মূর্ত্তিই এখানে সুচিত্রিত।

ব্যুচ্ছন্তী হি রশ্মিভির্বিশ্বমাভাসি রোচনম্।
তাং ত্বামুষর্বসূযবো গীর্ভিঃ কণ্বা অহূষত ॥ ৪

পদপাঠঃ। ব্যুচ্ছন্তী—হি—রশ্মিভিঃ—বিশ্বং—আভাসি—রোচনম্—তাং—ত্বাম্—উষঃ—বসূযবঃ—গীর্ভিঃ—কণ্বাঃ—অহূষত।

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে উষঃ! ব্যুচ্ছন্তী (তমোবর্জ্জয়ন্তী ত্বং) রশ্মিভিঃ (তেজোভিঃ) বিশ্বং (জগৎ সর্ব্বং প্রাণিজাতং বা) রোচনং (রোচমানং যথা স্যাৎ তথা) আভাসি (সমন্তাৎ প্রকাশসে) হি (যত এবং তস্মাৎ) তাং (তাদৃশীং) ত্বাং বসূযবঃ (বসুকামাঃ) কণ্বাঃ (মেধাবিনঃ ঋত্বিজঃ কণ্ববংশীয়াঃ বা) গীর্ভিঃ (স্তুতিবাক্যৈঃ) অহূষত (স্তুতবন্তঃ ।)

বঙ্গার্থ। হে উষা! যেহেতু তুমি প্রভাত সম্পাদন করিয়া রশ্মিসমূহ দ্বারা বিশ্ব আলোকিত করিয়া প্রকাশিত হও, সে জন্য ধনলাভেচ্ছু মেধাবিগণ বাক্যসমূহ দ্বারা তোমাকে স্তব করেন।

আলোচনা। 'ব্যুচ্ছন্তী' অর্থ 'তমোবর্জ্জয়ন্তী'—অন্ধকার দূরীভূত করিয়াছ যে তুমি। পূর্ব্বসূক্তে দেখা গিয়াছে 'ব্যুচ্ছ' অর্থ "প্রভাতংকুরু।" অন্ধকার দূর করা আর প্রভাত করা—ব্যাপার একই। অন্ধকারে আবৃত থাকায় রাত্রিতে বিশ্ব প্রকাশ পায় না, উষার আলোকসম্পাতে অন্ধকার অন্তর্হিত হইলে জগৎ প্রকাশিত হয়—ইহাই প্রভাতে বিশ্বের প্রকাশলাভ। ধন-কাম জনগণ, প্রভাতে ধনচেষ্টার সূচনা হয়—জানিয়া, ধনলাভার্থ উষারই স্তুতি করেন। অন্য অর্থে কণ্ববংশীয় মতমিরা ধনপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় উষার স্তুতি করেন। প্রভাতেই তাঁহারা দানশীলগণের নিকট ধন দান পাইবেন—মনে করিয়া, উষার স্তব করেন। এই মন্ত্রগুলির দ্রষ্টা বা ঋষি প্রস্কন্ন কণ্বের পুত্র। তিনি এই মন্ত্রগুলি প্রচার করিয়া ধনলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, কণ্ববংশের অপর সকলেও এই স্তোত্রকে ধনপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। অন্যভাবে উষা বা ঐশীশক্তির অন্য মূর্ত্তি ব্রহ্মবিদ্যা, অন্ধকার বা মোহ বা অবিদ্যা বিদূরিত করিয়া বিশ্ব-জীবতত্ত্বকে রোচন বা দীপ্তিশালী বা ব্রহ্মসংস্থ বা সপ্রকাশ করিয়া দেন। সেই জন্যই মেধাবীরা বা সাধনসম্পন্ন পুরুষেরা, ধনকাম বা পরমধন-পরমপুরুষার্থকাম হইয়া ঐ ব্রহ্ম-বিদ্যার স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করেন বা 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য-বিচার দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকারে প্রযত্ন করেন। বস্তুতঃ সাধকেরা যখন উষাদেবীর প্রকৃত মূর্ত্তি দর্শন করেন, তখন তাঁহাকে সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি! গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে—বলিয়া স্তব না করিয়াই পারেন না।

মাতৃহীনের বিলাপ।

কোথা গেলে জননী আমার!
এ জগৎ ভয়ে ভরা, তুমি ছিলে ভয়হরা-
প্রতিমূর্ত্তি যেন অভয়ার!
লইয়া শীতল বুকে, চাহিয়া প্রসন্ন মুখে
কত সুখ করেছ সঞ্চার!

কোথা গেলে জননী আমার !
স্মরিয়া তোমার কথা, কত যে পেতেছি ব্যথা—
ভাষা কি মা, আছে বর্ণিবার ?
তোমার স্নেহের ধনে, একাকী রাখি ভুবনে
সাজে কি এ গমন তোমার ?

কোথা গেলে জননী আমার !
তৃষিত চাতক মত, ধৈরয ধরিব কত ?
দরশন দিবে কবে আর ?
শুভ আশীর্ব্বাদ সাথ, বুলায়ে স্নেহের হাত
কবে মা, মুছাবে অশ্রুধার ?

কোথা গেলে জননী আমার !
যেদিন হইতে তুমি, ত্যজেছ মরত ভূমি
শূন্যময় হেরি চারিধার,—
যখন যে দিকে চাই, জুড়া'বার কিছু নাই,
দীর্ঘ শ্বাস ফেলি বারম্বার !

কোথা গেলে জননী আমার !
জন্মিয়া তোমার গর্ভে, এ কথা কহি মা, গর্ব্বে
এ মূর্ত্তি খুঁজিয়া মিলা ভার,
স্নেহ-দয়া-পরিপূর্ণ, সতত মুখ প্রসন্ন,
নেত্র-দৃষ্টি উৎস করুণার !

কোথা গেলে জননী আমার
তোমা মা হইয়ে হারা, থামে না নয়ন-ধারা,
প্রাণ সদা করে হাহাকার !
ডাকি এত মা মা রবে, তুমি কি শুননা তবে ?
রুদ্ধ কি সে বৈকুণ্ঠের দ্বার ?

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ।

বৈদিকসাহিত্যের কালনিরূপণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(মহাত্মা তিলকের Orion নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ)

নক্ষত্রগণের সংখ্যা কত এবং চান্দ্রমাস পূর্ণিমা বা অমাবস্যা হইতে আরব্ধ হইবে—এসম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু আমরা এ সকল অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া, বৎসরের প্রারম্ভ সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে—প্রাচীনকালে যজ্ঞ ও বৎসর একার্থবোধক বলিয়া গণ্য হইত, সুতরাং বর্ষপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞ আরব্ধ হইত, মনে করা যাইতে পারে। বেদাঙ্গজ্যোতিষ মতে সূর্য্যের উত্তরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে বৎসর আরব্ধ হইত, শ্রৌতসূত্র অনুসারে "গবাম্ অয়নং" প্রভৃতি বার্ষিকযজ্ঞ সেই সময়ে আরব্ধ হইত। * জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণ লিখিয়াছেন যে—সমুদয় দৈবক্রিয়া উত্তরায়ণের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইত—এরূপ প্রবাদ ছিল। উত্তরায়ণ অর্থে এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, সূর্য্যের মকরক্রান্তি হইতে কর্কট-ক্রান্তি পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে যে সময় অতীত হয়,—তাহার কথা বলা হইতেছে। সুতরাং যখন যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানসমূহ প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, সেই প্রাচীন বৈদিককালে উত্তরায়ণের প্রারম্ভ হইতে বর্ষগণনা আরম্ভ করা হইত; কিন্তু বর্ষব্যাপী সত্রসমূহে যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত, তাহা সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি জন্মিবে যে, সত্রসমূহ ঠিক্ সূর্য্যের উত্তরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে আরব্ধ হইত না। সত্রের মধ্যদিবসকে "বিষুবান্ দিবস" বলা হইত। ইহা স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে যে, যেমন "বিষুবান্ দিবস" বৎসরকে সমান দুইভাগে বিভক্ত করে, সেইরূপ ঐ মধ্যদিবস সত্রকে সমদ্বিখণ্ড করে। ** সুতরাং সত্র ও বৎসর অন্বর্থ বলিয়া গণ্য হইত এবং সত্রের অনুষ্ঠান বৎসরের গতির সহিত একভাবে চালিত হইত। দিবা ও রাত্রির পরিমাণ সমান হইলে সেইদিনকে "বিষুবান্ দিবস" বলা হইত, কিন্তু উত্তরায়ণের প্রারম্ভ হইতে বৎসরের আরম্ভ হইলে 'বিষুবান্ দিন' বৎসরের মধ্যদিবস হইতে পারেনা এবং সেই হিসাবে সত্রের মধ্যদিবস "বিষুবান্ দিবস" না হইয়া সূর্য্যের দক্ষিণ

---

* বেদাঙ্গজ্যোতিষ—৫ আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র ১·২·১৪ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

** ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৪·২২ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১·২·৩।

অয়নের প্রারম্ভ-দিন বলিয়া গণ্য করিতে হয়। সত্র সম্বন্ধে "বিষুবান্" শব্দটী গৌণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—এরূপ ধরিয়া লইলেও ঠিক্ মীমাংসা হয় না; কেননা এরূপস্থলে ঐ শব্দটী কখনও অন্ততঃ মুখ্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—এরূপ কল্পনা করিতে হয়। সুতরাং যদি সত্র সম্বন্ধে ইহার মুখ্য অর্থ গ্রহণীয় না হয়, তবে বৎসর সম্বন্ধে নিশ্চয়ই উহা গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব "বিষুবান্" যদি বৎসরের মধ্যদিবস বলিয়া গণ্য হয়, তবে যেদিন দিবস ও রাত্রির পরিমাণ সমান, সেই দিন হইতে বৎসরের আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 'উত্তরায়ণ' শব্দটীরও দুই অর্থ কল্পনা করা যাইতে পারে। সূর্য্যের মকরক্রান্তি হইতে উত্তরদিকে প্রত্যাবর্ত্তন করা, কিম্বা বিষুবরেখা অতিক্রম করিয়া উত্তরদিকে গমন করা,—এই দুই অর্থেই এই শব্দটী ব্যবহার করা হইয়াছে, মনে করা যাইতে পারে। প্রথম অর্থ গ্রহণ করিলে "উত্তরায়ণ" ও "বৎসর" সূর্য্যের মকরক্রান্তি অতিক্রমের দিন (অর্থাৎ যেদিন রাত্রির পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক) হইতে আরব্ধ হইত এবং দ্বিতীয় অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করিলে, বসন্তকালের যেদিন দিবা ও রাত্রির পরিমাণ সমান, সেইদিন হইতে বৎসর প্রবর্ত্তিত হইত, ইহা মনে করিতে হইবে। বর্ষব্যাপী সত্রের মধ্যদিবসকে "বিষুবান্" বলা হইত, বসন্তঋতুকে "আদ্য ঋতু" বলিয়া গণ্য করা হইত এবং আগ্রায়ণেষ্টি অর্থাৎ যাণ্মাসিক যজ্ঞ বসন্ত ও শরৎকালে সম্পন্ন হইত; সেজন্য ইহা অনুমান করা যায়—যে বৈদিকসময়ে 'উত্তরায়ণ'-শব্দের উপর্য্যুক্ত দ্বিতীয় অর্থই সমীচীন বলিয়া গণ্য হইত। আরও বিস্তৃতভাবে এ বিষয় সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

বৈদিকসাহিত্যে যেস্থলে "দেবযান" ও "পিতৃযান" অর্থাৎ মৃতব্যক্তিদিগের আত্মার জন্য শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ত্মের বিষয় লিখিত হইয়াছে, সেইস্থলে মাত্র "উত্তরায়ণ" সম্বন্ধে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদেও এই দুইটী শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নি এই দুইটী পথের বিষয় জানিতেন * এবং বাজসনেয়ী সংহিতায় (১৯-৪৭) বিনাশশীল জীবগণের পক্ষে এই দুইটী পথের উল্লেখ আছে—এই কথা লিখিত আছে। ঋগ্বেদে (১০-১৮-১) দেবযানের বিপরীত পথকে "মৃত্যুদেবতার পথ" বলিয়া বলা হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী অংশে (১০-৯৮-১) অগ্নি, দেবযানের বিষয় জ্ঞাত ছিলেন, জানা যায়। ঋগ্বেদে কোনস্থলে দেবযান-শব্দের বিশেষ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া

* ঋগ্বেদে ১-৭২-৭ এবং ১০-২-৭।

যায় না। সুতরাং বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যোপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থে ঐ শব্দের বিশদব্যাখ্যা দেখিতে হইবে। পরবর্ত্তী গ্রন্থাবলিতে ঐ সকল শব্দ ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের অর্থের পরিবর্ত্তন সম্ভব হইলেও মূল অর্থ যে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে—ইহা সম্ভব মনে হয় না। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে এই দুইটী পথ কিরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দেখা একান্ত প্রয়োজনীয়। "অর্চ্চি, অহঃ, পরিবর্দ্ধনশীল চন্দ্র, উত্তরায়ণের ষণ্মাস, দেবলোক, (দেবপথ) অর্থাৎ দেবতাদিগের আবাসস্থল"—ইহাদের পুনরাবৃত্তি নাই, কিন্তু "ধূম, রাত্রি, ক্ষয়শীলচন্দ্র, দক্ষিণায়নের ষণ্মাস, পিতৃলোক" সম্বন্ধে ইহাদের ঠিক্ বিপরীত। * ভগবদ্গীতায় (৮ অধ্যায় ২৪-২৫) ঐভাবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে—"উত্তরায়ণের ষণ্মাস, অথবা সেই 'ছয়মাস, যখন সূর্য্য উত্তরদিকে থাকেন"—এই বাক্যাংশগুলির অর্থ কি? প্রায় সমুদয় টীকাকারগণ এই ছয়মাসকে সূর্য্যের মকরক্রান্তি হইতে কর্কটক্রান্তি-পর্য্যন্ত গমন করিতে যে ছয়মাস সময় অতিবাহিত হয়,—সেই সময় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। † কিন্তু পরবর্ত্তিকালের জ্যোতিষগ্রন্থাবলীর সহিত ঐ সকল টীকার ঐক্য থাকিলেও বৈদিকগ্রন্থ-লিখিত মতের সহিত তাহাদের সম্পূর্ণ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। তৈত্তিরীয়সংহিতায় (৬-৫-৩) লিখিত আছে যে—"সূর্য্য ছয়মাস উত্তরদিকে যান, ও ছয়মাস দক্ষিণদিকে যান।" ইহাতে "উত্তরদিকে যাওয়া" সম্বন্ধে ঠিক্ অর্থবোধ হয় না। ইহা দ্বারা বিষুবরেখা হইতে উত্তরদিকে, কিম্বা মকরক্রান্তি হইতে উত্তরদিকে যাওয়া—দুইই বুঝাইতে পারে। ইহার স্থির মীমাংসা করিবার জন্য আমাদিগকে অন্যত্র চেষ্টা করিতে হইবে। শতপথব্রাহ্মণে (২-১ ৩, ১-৩) যেখানে পিতৃযান ও দেবযানের বিষয় লিখিত হইয়াছে, সেখানে আমরা দেখিতে পাই যে, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—দেবঋতু; শরৎ, হেমন্ত, শীত—পিতৃঋতু; বর্দ্ধনশীল পক্ষ দেবপক্ষ, ক্ষয়শীল পক্ষ পিতৃপক্ষ, দিন এবং দিনের প্রথম অংশ দেবতাদিগের এবং রাত্রি ও দিনের শেষ অংশ পিতৃদিগের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। "যখন সূর্য্য উত্তরদিকে যান, তখন দেবগণের মধ্যে অবস্থিতি করেন ও তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন; যখন দক্ষিণদিকে যান, তখন পিতৃগণের মধ্যে অবস্থিতি করেন।" ইহা দ্বারা দেবযান, দেবপথ, উত্তরায়ণ প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে

* বৃহদ্ ৬-২-১৫, ছান্দোগ্য ৪-১৫-৫।

† "জ্যেষ্ঠাদির্দক্ষিণায়নম্" প্রশ্নোপনিষদ্ আনন্দগিরি টীকা ১-৯।

সকল সন্দেহ দূরীভূত হইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, শতপথব্রাহ্মণের একটী অংশ মাত্র। সুতরাং যদি আমরা তাহার একটীর অন্তর্গত কোনও বিষয়ের যে অর্থ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, অন্যটীর অন্তর্গত তদনুরূপ বিষয় সম্বন্ধে সেই অর্থই গ্রহণ করি, তাহা হইলে দোষের কারণ হইবে না। সুতরাং যদি বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—দেবঋতু বলিয়া গণ্য হয় এবং যদি সূর্য্য উত্তরদিকে চলিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার দেবগণের মধ্যে অবস্থিতি করা হয়, তাহা হইলে 'দেবযান' বা 'উত্তরায়ণ' কখনও রবিমার্গের উত্তরায়ণবিন্দু (যেদিন সূর্য্য মকরক্রান্তি ত্যাগ করিয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হন সেদিন) হইতে আরব্ধ হইতে পারেনা; কেননা, ভূ-গোলার্দ্ধের কোন অংশেই উত্তরায়ণ-বিন্দু হইতে দেবঋতুর প্রারম্ভ বা বসন্তকালের আরম্ভ হয় না। মধ্যএসিয়া ও ভারতবর্ষে ঋতুপ্রবর্তনকালের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে দক্ষিণায়নবিন্দু হইতে বর্ষাকাল প্রবর্তিত হয়, আর মধ্যএসিয়ায় শারদবিষুববিন্দু হইতে বর্ষাকালের আরম্ভ হয়, কিন্তু কোনস্থানেই উত্তরায়ণ-বিন্দু হইতে বসন্তকালের আরম্ভ হয় না, কিম্বা দক্ষিণায়নবিন্দুতে বর্ষাকালের শেষ হয় না। সুতরাং সূর্য্য যে ছয়মাস বিষুবরেখার উত্তরে অবস্থান করেন—সেই ছয়মাস কাল অর্থাৎ বাসন্তবিষুববিন্দু হইতে শারদবিষুববিন্দু পর্য্যন্ত তাঁহার ভ্রমণকাল ঐ সময়ে "দেবযান" বলিয়া খ্যাত হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা হইতে অনুমান করা যায়, যে, পূর্ব্বকালে দক্ষিণায়নবিন্দু হইতে বর্ষাকাল আরব্ধ হইত না,—শারদবিষুব-বিন্দুতেই বর্ষণ শেষ হইত। এই হিসাবে উত্তরায়ণ-বিন্দু হেমন্তকালের মধ্যে আসিয়া পড়ে। আধুনিক জ্যোতিষগ্রন্থে উত্তরায়ণ-বিন্দু হেমন্তকালের মধ্যে না হইয়া 'শেষে' এবং বাসন্তবিষুববিন্দু বসন্তকালের 'মধ্যে' অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যখন প্রাচীন আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথম বাস করেন, তখন প্রকৃতির পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য, প্রাচীন ঋতুসমূহের পর্য্যায়ক্রম সম্বন্ধে পরিবর্তন করিতে বাধ্য হযেন, কিন্তু কখন এই পরিবর্তন সাধিত হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। * পূর্ব্বে যেরূপ ঋতুর পর্য্যায়ক্রম সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বসন্তঋতু ঐ প্রাচীনকালে, বাসন্তবিষুববিন্দু হইতে আরব্ধ হইত। বসন্তকে কেন "প্রথম ঋতু" বলা হইয়াছে এবং নক্ষত্র সকলকে কেন "দেবনক্ষত্র" ও

* আমার প্রণীত Life in Ancient India ৩৭১ পৃঃ Kaegis Rigveda ১১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

"যমনক্ষত্র" আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে, তাহার কারণ আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি। * কেহ কেহ কোনও প্রকার কুসংস্কারের সংস্রব পরিহার করিবার জন্য উপর্য্যুক্ত বিষয়গুলি রূপক-অর্থে গ্রহণীয় বলিয় মনে করেন, ¶ কিন্তু এইরূপ কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা গ্রহণ করা সমীচীন নহে, তাহার বিশেষ প্রয়োজনও দেখা যায় না। দেব ও পিতৃগণের পথের বিষয় ঋগ্বেদে অনেকবার উল্লিখিত হইয়াছে। যদিও ব্রহ্মবাদিগণ যথাসাধ্য এই ধারণার সম্প্রসারণ করিয়াছেন, কিন্তু মূল ধারণাটী যে অতি প্রাচীন এবং সূর্য্যের উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধে ভ্রমণ হইতেই এই ধারণার সৃষ্টি, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রতিকূল কোন প্রমাণ না থাকায়, আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, প্রাচীন বৈদিকসময়ে সূর্য্য যখন বাসন্তবিষুববিন্দু অতিক্রম করিয়া উত্তরগোলার্দ্ধে প্রবেশ করিতেন, সেই সময় হইতে বৎসরের আরম্ভ হইত—অর্থাৎ উত্তরায়ণ, বসন্ত, বৎসর এবং সত্র—সবই ঐ একসময় হইতে আরব্ধ হইত। বর্ষার পর যখন শারদবিষুববিন্দুতে সূর্য্য প্রত্যাগমন করিতেন, তখন হইতে বৎসরের শেষ অংশকে পিতৃযান বা দক্ষিণায়ন বলা হইত এবং সন্ধিস্থল-জ্ঞাপক দিনকে বৎসরের "মধ্য দিবস" বলিয়া ধরা হইত। ঠিক্ কোন্ সময় হইতে বাসন্তবিষুববিন্দুর পরিবর্ত্তে উত্তরায়ণ-বিন্দু হইতে বৎসর-গণনা আরব্ধ হইয়াছে, তাহা অনুমান করা কঠিন, কিন্তু বাসন্তবিষুববিন্দু কৃত্তিকা-নক্ষত্রে অবস্থিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে এবং ঐ সময় হইতেই "উত্তরায়ণ" অর্থে বৎসরের প্রথম অর্দ্ধ সূচিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ যখন রবিমার্গের সর্ব্বদক্ষিণবিন্দু হইতে উত্তরাভিমুখে সূর্য্যের প্রত্যাবর্ত্তন করাকে "উত্তরায়ণ" নামে অভিহিত করা হইত—বুঝা যায়, তখন উক্ত ধারণা আরও দৃঢ়ীভূত হয়। আমার মতে, প্রাচীনকালে মাত্র "দেবযান" ও "পিতৃযান" "দেবলোক" ও "পিতৃলোক" এই কয়টী শব্দ ব্যবহৃত হইত। উল্লিখিত বিষয় হইতে ইহা সহজেই অনুমেয় যে, ঋগ্বেদে এরূপ অর্থে উত্তরায়ণ-শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। যজ্ঞপ্রথা যে দেবপথ ও পিতৃপথনামক বৎসরের দুই অর্দ্ধভাগের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অনুষ্ঠিত হইত—বর্ষব্যাপী সত্রের মধ্যদিবস 'বিষুবান্'নামে অভিহিত হওয়ায় তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিছুকাল পরে উত্তরায়ণ-বিন্দু হইতে

* তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ১—১, ২, ৬ এবং ১—৫, ২, ৬

¶ টমসনের ভগবদ্গীতা ৬০ পৃঃ

বর্ষ-গণনা-প্রথা আরব্ধ হইল এবং এই পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়ায় কিছুসময় পরে বৎসরের দুই অর্দ্ধভাগ "উত্তরায়ণ" ও "দক্ষিণায়ন" শব্দ দ্বারা সূচিত হইতে থাকিল, কিন্তু তাই বলিয়া "দেবযান" ও "পিতৃযান" শব্দের পূর্ব্ব-সংস্কার-বদ্ধ অর্থ একেবারে লুপ্ত হইল না। নূতন যাজ্ঞিকক্রিয়া-সকল উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন অনুসারে সম্পাদিত হইতে লাগিল, কিন্তু পিতৃযান, দেবযান ও তচ্ছংসৃষ্ট সংস্কারাবলি সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান রহিল, এবং কাল-ক্রমে উহারা নূতন প্রথার সহিত মিলিত হইয়া গেল, কিম্বা পুরোহিতগণ লোকের ইচ্ছানুসারে এই দুই মত অনুসারে যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া দুই মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। সুতরাং প্রাচীন বৈদিকসময়ের বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে বা তাহাদের সূক্ষ্ম অর্থ সংগ্রহ করিতে হইলে, বর্ত্তমানসময়ের 'উত্তরায়ণ'-শব্দের লোকপ্রসিদ্ধ অর্থের সহিত ঐ শব্দের বৈদিককাল-প্রচলিত অর্থের পার্থক্য সম্বন্ধে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় একজন সূক্ষ্মদর্শী জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত যখন "উত্তরায়ণকাল" কিরূপে "দেবতাদিগের দিন" বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, ঠিক্ বুঝিতে পারেন নাই, তখন কত সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক আমাদিগকে বৈদিককাল-প্রচলিত কিম্বদন্তী বা প্রবাদ সকলের অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থে, তিনি, কিরূপে তৎকাল-প্রচলিত "উত্তরায়ণ"শব্দের অর্থে দেবতাদিগের দিন বুঝাইতে পারে—এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, দেবগণ যখন উত্তরমেরুতে অধিষ্ঠান করিতেন বৎসরের সেই ছয়মাস,—যে সময়ে সূর্য্য উত্তরগোলার্দ্ধে থাকিতেন সেই ছয়মাস, তাঁহারা সূর্য্যকে দেখিতে পাইতেন, সুতরাং ঐ ছয়মাসকে "দেবগণের দিবস" বলা যায়। কিন্তু সেই সময় "উত্তরায়ণ"শব্দে উত্তরায়ণবিন্দু হইতে দক্ষিণায়নবিন্দু পর্য্যন্ত সূর্য্যের গমনকাল সূচিত হইত। এই সময় কেন জ্যোতিষসংহিতাগুলিতে "দেবতাদিগের দিন" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, ভাস্করাচার্য্য তাহা বুঝিতে পারেন নাই। যদি মেরুপ্রদেশস্থিত দেবগণের নিকট বাসন্তবিষুববিন্দু হইতে দক্ষিণায়নবিন্দু পর্য্যন্ত সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হয়েন, তবে সেই সময় হইতে আরও তিনমাস কাল অর্থাৎ সূর্য্যের বিষুব-রেখায় প্রত্যাবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত সময় সূর্য্য নিশ্চয়ই দৃষ্টিগোচর হইবেন, কিন্তু সংহিতাকারগণের মতে উত্তরায়ণের (অর্থাৎ ভাস্কর, উত্তরায়ণ-শব্দের যে অর্থ বুঝিতেন) সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণায়নবিন্দুতে দেবগণের দিবস শেষ হইয়া

থাকে। এই সমস্যার সমাধান কি? ভাস্কর নিজে ইহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই এবং তিনি উহা ফলিতজ্যোতিষের বিষয় মনে করিয়া, সিদ্ধান্ত-শিরোমণির পাঠকগণকে উপর্য্যুক্ত বিরুদ্ধভাবাত্মক বিষয় দুইটীর সামঞ্জস্য সম্পাদন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। * যদি ভাস্কর জানিতেন যে, "উত্তরায়ণ"-শব্দ "দেবযান"-শব্দের পরিবর্ত্তে—কখনও কখনও বাসন্তবিষুববিন্দু হইতে শারদবিষুববিন্দু পর্য্যন্ত সূর্য্যের-ভ্রমণ পথের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে, সংহিতাকারগণ ফলিতজ্যোতিষ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের মত গণিতশাস্ত্রানুযায়ী নির্ভুল না হইতে পারে—এরূপ উত্তর শুনিবার জন্য তিনি আমাদিগকে উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন না। প্রাচীন আর্য্যগণ উত্তরমেরুর তত নিকটে কখনও বাস করিতেন কিনা, (যাহাতে তাঁহাদের দিনের পরিমাণ ছয়মাস না হইলেও অন্ততঃ ২। ৩ মাস হইত,) তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু, সূর্য্য যখন বিষুবরেখা অতিক্রম করিয়া উত্তর-দিকে অগ্রসর হয়েন, তখন দেবতাদিগের দিবস আরব্ধ হয়—ইহা অতি-প্রাচীন কথা। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩-৯, ২২) আমরা দেখিতে পাই যে, দেবতাদিগের একদিনে আমাদিগের এক বৎসর হয়। এমন কি, হেরোডোটাস্ (খৃঃ ৪০০ অব্দে) এরূপ একপ্রকার লোকের উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা বৎসরের মধ্যে ছয়মাস নিদ্রিত থাকে। * যদি উপর্য্যুক্ত বৈদিক প্রবাদবাক্য, বাস্তবিকই উহাকে যত প্রাচীন মনে করা হয় তত প্রাচীন হয়, তবে, উত্তরায়ণ-শব্দের পরবর্ত্তী অর্থের সহিত ইহার সামঞ্জস্য রক্ষা করা অসম্ভব নহে, এবং ইহা দ্বারা শতপথব্রাহ্মণবর্ণিত বাসন্তবিষুবিন্দু হইতে উত্তরায়ণের প্রারম্ভ সম্বন্ধে ধারণা আরও দৃঢ়ীভূত হয়।

আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বৎসরের প্রবর্ত্তন-কাল যখন বাসন্ত-বিষুবিন্দু হইতে উত্তরায়ণবিন্দুতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তখন উত্তরায়ণ-শব্দের প্রাচীন অর্থ লুপ্ত হইয়াছিল—কিম্বা উহা কেবল অয়ন-ভেদে বৎসরের দুই অংশকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত। কিন্তু, ইহাই কেবল ঐ পরি-বর্ত্তনের একমাত্র ফল নহে। বৎসরের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষব্যাপী সত্রগুলির আরম্ভকালও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া উত্তরায়ণবিন্দু হইতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল

---

* সিদ্ধান্তশিরোমণি গোলাধ্যায়-৭-১১-১২।

* Narrien's origin and progress of Astronomy ১৫১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

এবং যখন তৈত্তিরীয়-সংহিতা প্রণীত হয়, তখন এই পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ হইয়াছিল। শতপথব্রাহ্মণোক্ত বর্ণনা ভিন্ন প্রাচীনপদ্ধতির আর কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করা সম্ভব নহে। সত্রের আরম্ভকাল পরিবর্ত্তিত হওয়ায় "বিষুবান্" দিবসেরও মুখ্য অর্থ ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়াছিল এবং পরে উহা দ্বারা বর্ষব্যাপী সত্রের "মধ্য দিবস" ভিন্ন আর কোনও অর্থের প্রতীতি হইত না।

প্রাচীনপদ্ধতি কিন্তু লোকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিল না। নক্ষত্রযজ্ঞ আরম্ভ করিতে হইলে বাসন্ত-বিষুববিন্দু হইতে সত্রের আরম্ভ-কাল গণনা করা হইত। গর্গ বলেন—"নক্ষত্রগণের মধ্যে যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানে কৃত্তিকা এবং সংখ্যা-গণনায় শ্রবিষ্ঠা প্রথমরূপে গণ্য হয়।" ¶ পরবর্ত্তী লোকেরা এই পার্থক্যও রাখিতে পারেন নাই এবং 'উত্তরায়ণ' শব্দে উত্তরায়ণ-বিন্দু হইতে দক্ষিণায়নবিন্দু পর্য্যন্ত সূর্য্যের ভ্রমণ-কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—এরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি, ভাস্করাচার্য্য এই অর্থে কোন কোন স্থলে বৈষম্য উপলব্ধি করিয়াও ঐ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে আমরা নর্ম্মদানদীর দক্ষিণস্থ প্রদেশে বাসন্ত-বিষুববিন্দু হইতে সাধারণকার্য্যের জন্য বৎসর-গণনা আরম্ভ করিয়া থাকি, এবং উত্তরায়ণে অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মকার্য্য করিতে হইলে, উত্তরায়ণবিন্দু হইতে উত্তরায়ণ প্রবর্ত্তিত হইল—মনে করিয়া, ঐ সকল ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকি। যখন আমরা এই বর্ত্তমানযুগেও ক্রিয়াবিশেষের জন্য দুই প্রকার বৎসরের আরম্ভকাল গ্রহণ করিয়া থাকি, তখন সুদূর অতীতযুগে যদি প্রাচীন আর্য্যগণ বৎসরের প্রারম্ভকাল উত্তরায়ণবিন্দুতে পরিবর্ত্তিত করিয়া, গর্গ-বর্ণিত বিভিন্নপ্রকার কার্য্যের জন্য বিভিন্ন বৎসর-প্রবর্ত্তন-কালের নির্দ্দেশ করিয়া, নূতন ও পুরাতন পদ্ধতির সংরক্ষণে যত্নবান্ হইয়া থাকেন, তাহাতে বিস্মৃত হইবার কিছুই নাই। পুরাতনপ্রথা পরিত্যাগ করিতে না হইলে, ইহা ভিন্ন উপায়ান্তরও ছিল না।

¶ সোমাকার বেদাঙ্গজ্যোতিষ ৫ "তেষাং চ সর্ব্বেষাং নক্ষত্রাণাং কর্ম্মসু কৃত্তিকাঃ প্রথমমাচক্ষতে শ্রবিষ্ঠাং সংখ্যায়াঃ॥"

মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গস্বামী।

আদর্শচরিত্রপ্রভাব, নিষ্কাম ভগবৎপ্রেম এবং অলৌকিক সাধনা দ্বারা যে সমস্ত মহাপুরুষ ভারতভূমিকে ধন্য, পুণ্য ও পবিত্র করিয়া সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন, মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গস্বামী তাঁহাদের অন্যতম। আজ এই মহাত্মার চরিত-কথা হিন্দু-পত্রিকার পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশশতাব্দীর প্রারম্ভে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশের অন্তর্গত বিজলা-নামক জনপদস্থিত হোলিয়ানগরে নৃসিংহধর-নামে একজন সমৃদ্ধিশালী জমিদার বাস করিতেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি দুইবার দার-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় ১০১৪ সালের পৌষমাসে তাঁহার প্রথমা সহধর্ম্মিণীর গর্ভে ত্রৈলিঙ্গস্বামীর জন্ম হয়। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভেও ইহার পর একটি পুত্রসন্তান জন্মেন, তাঁহার নাম শ্রীধর।

দিন-দিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া ত্রৈলিঙ্গ ক্রমে শৈশব হইতে বাল্যে, বাল্য হইতে কৈশোরে এবং কৈশোর হইতে যৌবনে পদার্পণ করিলেন এবং তাঁহার পিতা-মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। পিতা নৃসিংহধর, পুত্রকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু ত্রৈলিঙ্গ কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজী হইলেন না। এইভাবে অবিবাহিত অবস্থায় ত্রৈলিঙ্গ চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিলে, পিতা নৃসিংহধর, স্বর্গে গমন করিলেন। পিতার স্বর্গারোহণের দ্বাদশ বৎসর পরে মাতা বিদ্যাবতীও নশ্বর সংসার ত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন। পিতার মৃত্যুর পর ত্রৈলিঙ্গ মাতার মনস্তুষ্টির জন্য সংসার-কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে বিদ্যাবতী দুইচক্ষু মুদ্রিত করিলেন, সেই মুহূর্ত্তে ত্রৈলিঙ্গ পিতৃপরিত্যক্ত অতুল বিভব, মনোহর প্রাসাদ—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, শ্মশানের বিভূতি অঙ্গে লেপন করিয়া, বিভূতি-ভূষণের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। কৈকেয়ী-নন্দন ভরতের ন্যায় শ্রীধর, অগ্রজের মতিগতি ফিরাইয়া তাঁহাকে সংসারে আনিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইলেন না। অনন্তর তিনি সেই শ্মশান-সমীপে ত্রৈলিঙ্গের বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া ঘরে ফিরিলেন। ত্রৈলিঙ্গ তথায় দীর্ঘ বিংশতিবর্ষ ধ্যানে অতিবাহিত করেন। ১০৯২ সালে ভগীরথ-স্বামী নামে জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট পুষ্করতীর্থে ত্রৈলিঙ্গ দীক্ষা-গ্রহণ

করিয়া "গণপতি স্বামী" নামে অভিহিত হন। ১১০২ সালে তাঁহার দীক্ষাগুরু সাধনোচিতধামে গমন করিলে, ত্রৈলিঙ্গ (গণপতি স্বামী) তীর্থভ্রমণ-মানসে তথা হইতে বহির্গত হন। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ১১০৪ সালে সেতুবন্ধ-রামেশ্বরতীর্থে উপস্থিত হন। তাঁহার সেখানে অবস্থানকালে একদিন মধ্যাহ্ন-কালে হঠাৎ একটি ব্রাহ্মণ সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ব্রাহ্মণটীর মৃত্যু হওয়ার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে তিনি সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। যখন ব্রাহ্মণটীর আত্মীয়-স্বজন তাঁহার মৃতদেহ সংকার করিবার জন্য লইয়া যাইতেছিলেন, তিনি তখন সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া মৃতব্যক্তির শরীরে আপন কমণ্ডলু হইতে ৩।৪ বার জল ছিটাইয়া দিলেন, তাহাতেই ব্রাহ্মণ বাঁচিয়া উঠিলেন। এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে লোক ত্রৈলিঙ্গস্বামীর নিকট ভূত ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য ও তত্ত্বো-পদেশ লাভ করিবার জন্য আসিতে লাগিল। ত্রৈলিঙ্গস্বামী তথা হইতে সুদামা-নামক স্থানে যাইয়া এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেখানেও দিন দিন তাঁহার অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া লোকে তাঁহার নির্জ্জন-সাধনার ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল, কাজেই তিনি সেখান হইতে পথের সম্বল কম্বল গুটাইলেন।

১১০৮ সালে ত্রৈলিঙ্গস্বামী নেপালে উপস্থিত হন। সেখানেও এক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হয়। একদিন নেপালের প্রধান সেনাপতি একটি ব্যাঘ্রকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোঁড়েন, কিন্তু গুলি ব্যাঘ্রের দেহ স্পর্শ করে না। তখন ব্যাঘ্র আর্ত্তনাদ করিতে করিতে যেখানে ত্রৈলিঙ্গস্বামী বসিয়া গভীরধ্যানে নিমগ্ন—সেইস্থানে যাইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়ে। স্বামিজী ব্যাঘ্রের গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে আশ্বস্ত করেন। ইত্যবসরে প্রধান সেনাপতিও সেইখানে উপস্থিত হন। তখন তিনি ব্যাঘ্রটীকে এক বিরাটকায় পুরুষের পদপ্রান্তে বিড়ালের ন্যায় লুটাইয়া থাকিতে দেখিয়া, নিজে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকেন। তখন স্বামিজী সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া সৈনিকপুরুষকে বলিলেন—"বাবা, এত আশ্চর্য্য হইবার প্রয়োজন কি? তুমি যদি নিজে হিংসা পরিত্যাগ কর—তবে কোনও হিংস্র প্রাণীই তোমার প্রতি হিংসা করিবে না।" সেনাপতি তখন স্বামিজীর নিকট নানা উপদেশ শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন; ব্যাঘ্রও নির্ভয়ে আপন আবাসে চলিয়া গেল।

এই ঘটনা নেপালের অধিপতির কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না।

নেপালাধিপতি এই সংবাদ শুনিয়া নানাবিধ বহুমূল্য রত্নরাজি লইয়া স্বামিজীকে উপঢৌকন দিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। স্বামিজী সে সমস্ত দেখিয়া একটু উপেক্ষার হাসি হাসিয়া সেস্থান ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন ও পরে প্রয়াগধামে গমন করিলেন। প্রয়াগে অবস্থানকালে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভয়ানক ঝড়বৃষ্টির উপক্রম হইতে লাগিল। রামতারণ ভট্টাচার্য্য নামক একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া স্বামিজীকে বলিলেন—"মহারাজ, এখনই প্রবলঝড়-বৃষ্টি হইবে—আপনি আমার সঙ্গে আসুন।" স্বামিজী শুনিয়া বলিলেন—"বাবা! আমার জন্য তুমি এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? আমি কোন প্রকার কষ্টই বোধ করিতেছি না। বিশেষতঃ আমি এখন এখান হইতে যাইতে পারিব না, কারণ ঐ যে অদূরে একখানি নৌকা আসিতেছে—উহা এখনই জলমগ্ন হইবে, উহার আরোহিগণকে বাঁচাইতে হইবে।" স্বামিজীর কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে অদূরে নৌকাখানি নিমজ্জিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ স্বামিজীও অদৃশ্য হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে নৌকা ভাসিয়া উঠিল ও তীরবেগে তীরের দিকে ছুটিল। আরোহিগণের সহিত এক দীর্ঘাকার পীবরতনু দিগম্বরমূর্ত্তি নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইলেন, দেখিয়া রামতারণ ও আরোহিগণ অবাক্ হইলেন। কোন্ সময় কোনভাবে স্বামিজী জলমগ্ন নৌকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং এতক্ষণই বা তিনি নৌকার কোথায় ছিলেন তাহা নৌকারোহিগণ কোনমতেই স্থির করিতে পারেন নাই। তখন স্বামিজী সমবেত আরোহিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বাবা সকল, তোমরা ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইও না। এরূপ ক্ষমতা মানুষমাত্রেরই আছে।"

১১৪৪ সালের মাঘ মাসে ত্রৈলিঙ্গস্বামী প্রয়াগ হইতে ৺কাশীধামে আগমন করেন এবং তথায় অসীঘাটে—তুলসীদাসের বাগানে অবস্থিতি করিতে থাকেন। কাশীতে তিনি যে সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতা দেখাইয়া তীর্থ-বাসিগণকে যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, তাহার সম্যক্ আলোচনা করিতে গেলে বৃহদাকার একখানি পুস্তক হইয়া পড়ে, তবে তাহার দুই একটি ঘটনা উল্লেখ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

একদা পুলিশবিভাগের কোন এক উগ্রপ্রকৃতি সাহেব, স্বামিজীকে উলঙ্গ দেখিয়া তাঁহাকে "ভণ্ডতপস্বী" মনে করিয়া ধরিয়া হাজতে চাবী বন্ধ করিয়া রাখেন। পরদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল, স্বামিজী প্রস্রাব করিয়া হাজত ঘরের মেঝে ভাসাইয়া দিয়াছেন এবং উৎফুল্লমুখে হাজতঘরের বাহিরে

বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন। সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি প্রকারে তুমি বাহিরে আসিলে এবং হাজত ঘরের মেঝেতে এত জলই বা কোথা হইতে আসিল?" তাহাতে স্বামিজী উত্তর করিলেন—"রাত্রে অতিশয় প্রস্রাবের বেগ হইয়াছিল, ঘরে চাবি বন্ধ থাকাতে আমাকে বাধ্য হইয়া ঘরের মধ্যেই প্রস্রাব করিতে হইয়াছে। তাহার পর প্রাতঃকালে যখন বাহিরে আসিবার ইচ্ছা হইল, দেখিলাম, দরজা খোলাই আছে। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, চাবি বন্ধ করিয়া কেহ কাহারও জীবন আবদ্ধ রাখিতে পারে না।" সাহেব তদবধি তাঁহাকে উলঙ্গাবস্থায় যথেচ্ছ বেড়াইতে হুকুম দিলেন।

১২১৭ সালে উজ্জয়িনীর মহারাজ ৺কাশীধামে বেড়াইতে আসেন। তিনি একদিন নৌকাযোগে গঙ্গাগর্ভে বেড়াইতে বেড়াইতে জলের উপর ভাসমান স্বামিজীকে দেখিতে পান। মহারাজ তাঁহাকে আপন নৌকায় উঠাইবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় স্বামিজীর নিকট প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই স্বামিজী আপনি নৌকায় উঠিয়া বসেন। মহারাজের হাতে একখানি বহুমূল্য তরবারি ছিল। সেই তরবারিখানি স্বয়ং কোম্পানীবাহাদুর তাঁহাকে অসমসাহসিক কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন; সুতরাং সেই অসিখানি তাঁহার বড়ই আদর ও শ্লাঘার বস্তু ছিল। স্বামিজী মহারাজের নিকট হইতে সেই তরবারিখানি চাহিয়া লইয়া জলে ফেলিয়া দিলেন। ইহাতে মহারাজের আর ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি স্থির করিলেন—নৌকা মণিকর্ণিকায় পৌঁছিলে এই ভণ্ডতপস্বীকে উপযুক্ত শাস্তি দিবেন। এদিকে স্বামিজী তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া জলের মধ্যে হাত ডুবাইয়া দিয়া দুইখানি একই প্রকারের তরবারি উঠাইলেন। মহারাজের হাতে সেই তরবারি দুইখানি দিয়া বলিলেন "ইহার মধ্যে যেখানি তোমার তাহা লও।" মহারাজ তরবারি দুইখানির মধ্যে কোন্‌খানি আপনার তাহা স্থির করিতে পারিলেন না; তখন স্বামিজী বলিলেন "তোমার নিজের জিনিস যখন তুমি চিনিয়া লইতে পারিলে না, তখন তোমার জিনিস বলিতেছ কেন? তোমার জিনিস হইলে তুমি নিশ্চয়ই চিনিয়া লইতে পারিতে। যাহা তোমার নিজের নহে, তাহার জন্য এত রোষ প্রকাশ করিতেছ কেন?" ত্রৈলিঙ্গস্বামী কখন প্রবল শীতের সময় বরফের ন্যায় শীতল গঙ্গা-জলে আকণ্ঠ ডুবাইয়া থাকিতেন, আবার কখন বা প্রবল গ্রীষ্মের দিনে উত্তপ্ত বালুকার উপর স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেন। কখন কখন তিনি জলচর প্রাণীর ন্যায় একাদিক্রমে ৩৪ ঘণ্টাকাল জলে বাইয়া থাকিতেন।

আবার কখনও বা শোলার মত জলে ভাসিতে ভাসিতে স্রোতের প্রতিকূলদিকে চলিয়া যাইতেন। জল, স্থল, শীত, গ্রীষ্ম, আহার, অনাহার, দিন রাত্রি তাঁহার নিকট সমান ছিল।

বিগত ১২৯৪ সালের পৌষমাসে সায়ংকালের প্রারম্ভে গোধুলিলগ্নে ২৮০ বৎসর বয়সে মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গস্বামী শিষ্যগণে পরিবৃত অবস্থায় যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া—দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগের একমাস পূর্ব্বে তিনি সমস্ত শিষ্য ও ভক্তগণকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে,—"অমুক দিন অমুক সময়ে আমি দেহত্যাগ করিব, অতএব তোমরা সেইদিন উপস্থিত থাকিও।"

স্বামিজীর তত্ত্বোপদেশ।

১। আমাদের চারিদিকে—অন্তরে ও বাহিরে যিনি নিত্য বিরাজ করিতেছেন—যিনি কর্ম্ম করিয়াও নিষ্ক্রিয়, তিনিই ঈশ্বর। এই বিশ্বের সীমা নাই—ঈশ্বরও অসীম। এই বিশ্বে যত স্থান আছে—তিনি সে সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন বলিয়া তিনি নিরাকার।

২। সৃষ্টি—জীব-সৃষ্টির প্রারম্ভে এই জগতে কেবল পরমাত্মার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। পরমাত্মা হইতে পঞ্চভূতের প্রকাশ। সেই পঞ্চভূতই সৃষ্টির উপাদানরূপে গৃহীত হইয়াছে। নিত্যচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা হইতে প্রথমে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে।

৩। চিত্তশুদ্ধি—হিন্দুসাধনের সার চিত্তশুদ্ধি। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের অনুরাগী অথবা হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম অনুসন্ধানে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে এই তত্ত্বের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়। সাকার বা নিরাকার-উপাসনা, একেশ্বরবাদ বা বহু-দেব-ভক্তি, দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদ, জ্ঞানবাদ, কর্ম্মবাদ বা ভক্তিবাদ সকলই ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর।

৪। ধর্ম্ম—অহিংসা, ভক্তি ও ভালবাসা ধর্ম্মের মূল। কেশাকুশি নাড়িলেই ধর্ম্ম হয় না, প্রত্যহ কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও ধর্ম্ম হয় না, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাব দিয়া হরিনামের ঝুলি হস্তে রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইলেও ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্মের নিকটে দ্বেষাদ্বেষ ভেদাভেদ নাই।

৫। উপাসনা—যদি ঈশ্বরকে জানিবার ও পাইবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে উপাসনা করা আবশ্যক। যাঁহার ঈশ্বরকে পাইবার ইচ্ছা নাই, তাঁহার উপাসনা করিবারও আবশ্যক নাই। উপাসনা বা আরাধনা, ঈশ্বরের বিশুদ্ধ শক্তিজাল আকর্ষণের যন্ত্র-স্বরূপ।

৬। পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম—বর্ত্তমানজন্মের যেটি ইহলোক, তাহাই পূর্ব্বজন্মের পরলোক—আর বর্ত্তমান-জন্মের পরলোকই ভবিষ্যৎ জন্মের ইহলোক। এই স্থূল শরীরের ভিতর আর একটি দেহ আছে তাহার নাম "সূক্ষ্মদেহ" এবং তাহার ভিতরেও আর এক দেহ আছে তাহার নাম "কারণদেহ"।

৭। সাধুসহবাসই স্বর্গ—এবং অসৎসঙ্গই নরকবাসের মূল।

৮। প্রত্যেক কার্য্যের অনুষ্ঠানের মূলে ধর্ম্ম থাকা চাই; নতুবা সিদ্ধি হয় না।

৯। দরিদ্রকে দান করিবে। ধনীকে দান করা বৃথা, কারণ তাহার আবশ্যক নাই।

১০। আলস্য সকল অনর্থের মূল।

১১। ছাদহীন গৃহে যেমন বৃষ্টিধারা পতিত হয়, চিন্তাহীন মনেও সেইরূপ রিপুগণ প্রবেশ করে।

১২। সংগ্রামে যে ব্যক্তি লক্ষ লোক জয় করিয়াছে, সে ব্যক্তি প্রকৃত বিজয়ী নহে। যে আপনাকে জয় করিয়াছে, সেই প্রকৃত বিজয়ী।

১৩। ইন্দ্রিয়সকলই মনুষ্যত্বের শত্রু।

১৪। আশা ক্ষয় হইলে এই পৃথিবীই স্বর্গ।

১৫। বিষয়ে অনুরাগকে বন্ধন বলে।

১৬। নারীই নরকের কারণ।

১৭। যে সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট, সেই অর্থশালী।

১৮। কামাতুর ব্যক্তিই অন্ধ।

১৯। সংসারই মানুষের চিররোগ। সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া বাসকরাই একমাত্র ঔষধ।

২০। যিনি মনকে জয় করিয়াছেন, তিনিই জগজ্জয়ী।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ ২৬

সান্বয়ব্যাখ্যা। অন্যেতু এবং (অতিমন্দাধিকারিণঃ পূর্ব্বোক্তসাংখ্যযোগাদি-মার্গেণ আত্মানং সাক্ষাৎ কর্ত্তুম্) অজানন্তঃ অন্যেভ্যঃ (আচার্য্যেভ্য উপদেশতঃ) শ্রুত্বা উপাসতে, তেঽপি শ্রুতিপরা[illegible]ঃ (শ্রদ্ধয়া উপদেশপরায়ণাঃ সন্তঃ) মৃত্যুং (মৃত্যুযুক্তং সংসারং) অতিতরন্তি (ক্রমেণ মুক্তিং লভন্তে ইত্যর্থঃ।) ২৬

বঙ্গানুবাদ। কোন কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ধ্যানযোগ বা সাংখ্যযোগাদি দ্বারা আত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে না জানায় গুরুর নিকট উপদেশ-শ্রবণ-পূর্ব্বক উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহারাও ভক্তি-শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া সাধনপূর্ব্বক মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করিয়া থাকেন। ২৬

আলোচনা। পূর্ব্বশ্লোকে যে কয়েকপ্রকার সাধনোপায় বলা হইয়াছে, তাহা সকলের পক্ষে সুগম হয় না। যাঁহারা ধ্যানযোগ সাংখ্যযোগ বা অষ্টাঙ্গযোগ সাধনে অসমর্থ অথবা অনভিজ্ঞ, তাঁহারা সাধু সদ্গুরুর আশ্রয়-গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তি-বিশ্বাস-সহিত গুরুপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া সাধন-ভজন করিয়া ক্রমে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। সদ্গুরুর প্রতি অচল-ভক্তি-বিশ্বাসপরায়ণ গুরুশুশ্রূষু ব্যক্তির মৃত্যুময়-সংসারতরণে ক্লেশ হয় না। ২৬

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাত্ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥ ২৭

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে ভরতর্ষভ! যাবৎ (যৎ) কিঞ্চিৎ স্থাবরজঙ্গমং সত্ত্বং (বস্তু) সংজায়তে (সমুত্পদ্যতে) তত্ (সর্ব্বং) ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাত্ বিদ্ধি (জানীহি)। ২৭

বঙ্গানুবাদ। হে ভরতর্ষভ! যত কিছু স্থাবর জঙ্গম বস্তু উৎপন্ন হয়, সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে হয় জানিও। ২৭

আলোচনা। এই অধ্যায়ের দ্বাদশশ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন—"জ্ঞেয়ং যত্ তত্ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে" যাহা জানিলে অমৃতত্ব-লাভ হয়, সেই 'জ্ঞেয়' তোমাকে বলিব। সেই জ্ঞেয় বিষয় ১৪শ হইতে ১৮শ শ্লোকে

ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পুনরায় সেই অমৃতত্বপ্রাপ্তির উপায় যে ব্রহ্মবিদ্যা—যে আত্মজ্ঞান যাহা সংসার-নিবৃত্তি করিয়া অমরত্ব প্রদান করিতে সমর্থ, তাহাই এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত বলিতেছেন। ক্ষেত্র ও প্রকৃতি অভেদ ; ক্ষেত্রজ্ঞ ও পুরুষ একই। প্রকৃতি জড়, পুরুষ চৈতন্য—এই উভয়ের সংযোগে পরস্পরের গুণ-গ্রহণে জগৎসৃষ্টি। এই সৃষ্ট জগৎ, ভগবানের মায়াকল্পিত, ঐন্দ্রজালিকের সৃষ্ট দৃশ্যের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী মাত্র। ইহা অসৎ হইয়াও সৎরূপে ভাসমান, যাঁহার এইরূপ জ্ঞান নিশ্চিত হইয়াছে, তাঁহারই অবিদ্যা দূরীভূত হইয়াছে—মিথ্যাজ্ঞান দূর হইয়াছে। তিনি প্রকৃতির গুণসহ পুরুষকে জানিয়া মুক্তিলাভের অধিকারী হইয়াছেন। ২৭

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৮

সান্বয়ব্যাখ্যা। সর্ব্বেষু ভূতেষু (ব্রহ্মাদিস্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু) সমং (সর্ব্বত্রৈকরূপং) তিষ্ঠন্তং (স্থিতিং কুর্ব্বন্তং) বিনশ্যৎসু (অপি) (মায়া-গন্ধর্ব্বনগরাদিপ্রায়েষু) অবিনশ্যন্তং পরমেশ্বরং যঃ পশ্যতি (বিবেকেন শাস্ত্রচক্ষুষা পশ্যতি) স (এব) পশ্যতি। ২৮

বঙ্গানুবাদ। সর্ব্বভূতে নির্ব্বিশেষরূপে অবস্থিত, সমস্ত পদার্থ বিনষ্ট হইলেও অবিনাশী, পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী। ২৮

আলোচনা। বস্তুমাত্রেই ক্ষয়শীল, কিন্তু আত্মা তাবৎ পদার্থে স্থিতি করিয়াও তত্তৎ বস্তুর নাশে বিদ্যমান থাকেন। তাঁহার উৎপত্তি-বৃদ্ধি-ক্ষয়াদি ধর্ম্ম নাই। সুবর্ণ-নির্ম্মিত অলঙ্কারের নামরূপ বিনষ্ট হইলে যেমন স্বর্ণ তেমন থাকে, সেইপ্রকার সৎস্বরূপ ব্রহ্মের মায়া বা অবিদ্যা-কল্পিত নামরূপময় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সৃষ্টির নাশ হইলে ব্রহ্মের কোন হানি হয় না। এইরূপ অক্ষয় অবিকৃত আত্মাকে যিনি দর্শন করেন, তিনি আত্মদর্শী ; তাঁহার দৃষ্টিই অভ্রান্ত। ২৮

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিং॥ ২৯

সান্বয়ব্যাখ্যা। সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতেষু) সমং সমবস্থিতং (তুল্যতয়াবস্থিতম্) ঈশ্বরং (পরমাত্মানং) পশ্যন্ (শাস্ত্রদৃষ্ট্যা সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্) হি (যস্মাৎ) আত্মনা (অবিদ্যয়া দেহাদিনা) আত্মানং (পরমাত্মানং ঈশ্বরং) ন হিনস্তি তত্ (তস্মাত্ অহিংসনাত্) পরাং (প্রকৃষ্টাং) গতিং (মোক্ষাখ্যগতিং) যাতি (প্রাপ্নোতি) ২৯

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সর্ব্বভূতে সমান ও সমভাবে বিদ্যমান আত্মরূপ ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া, আত্মা দ্বারা আত্মাকে হনন করেন না, সেই নিমিত্ত পরমগতি প্রাপ্ত হন। ২৯

আলোচনা। পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে, বিনাশশীল বস্তু সকলের মধ্যে যিনি অবিনশ্বর ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তিনিই সত্যদ্রষ্টা। যাহারা সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত পরমেশ্বরকে দেখিতে চেষ্টা করে না, তাহারাই আত্মঘাতী; কারণ তাহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে, এবং দেহের বিনাশের সঙ্গে আত্মার বিনাশ হইল স্থির করিয়া লয়। পরমাত্মাকে যাহারা আপন আত্মা বলিয়া জানেনা, তাহারা আত্মঘাতী। যাহারা মূর্খ অজ্ঞান, তাহারা আত্মাকে অনাদর করিয়া, দেহাদি অনাত্মাকে আত্মরূপে আদর করে, দেহের মৃত্যুতে আত্মার মৃত্যু হইল মনে করে, তাহারাই আত্মহননকারীর অবতার। যাঁহারা আত্মদর্শী, তাঁহারা অজ্ঞানমুক্ত অবিদ্যাশূন্য, সুতরাং দেহাদি দ্বারা আত্মাকে হিংসা করেন না। আত্মাকে হিংসা করেন না বলিয়া তাঁহারা পরমাগতি প্রাপ্ত হন। ২৯

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০

সান্বয়ব্যাখ্যা। যঃ (বিবেকী) কর্ম্মাণি (বাঙ্‌মনঃকায়ারভ্যাণি) সর্ব্বশঃ (সর্বৈঃ প্রকারৈঃ) প্রকৃত্যা এবচ ক্রিয়মাণাণি (নির্বর্ত্যমাণানি) পশ্যতি তথা আত্মানং (ক্ষেত্রজ্ঞং পুরুষং) অকর্ত্তারং পশ্যতি সঃ পশ্যতি (সম্যক্ পশ্যতি ইতি তেন চ স এব পরাংগতিং যাতি ইত্যর্থঃ।) ৩০

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্মসমূহ সর্ব্বপ্রকারে প্রকৃতি দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহাই যিনি দর্শন করেন, তজ্জন্য আত্মাকে যিনি অকর্ত্তা মনে করেন, তিনিই সম্যগ্দর্শী। ৩০

আলোচনা। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতে যাহা কিছু কর্ম্ম হইতেছে তাহা প্রকৃতিই করিতেছেন, প্রকৃতির নিয়মেই সকল হইতেছে, আর আত্মা নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পরমশান্ত সাক্ষিস্বরূপ দ্রষ্টা মাত্র—এইভাবে আত্মাকে দর্শন করিয়া যিনি প্রকৃতি হইতে তাঁহাকে সম্পূর্ণ পৃথক্ দেখেন, তিনি সর্ব্বত্র সমভাবে আত্মদর্শন করেন; তিনিই সম্যক্‌দর্শী; তিনিই পরমগতি লাভ করেন। ৩০

যদা ভূত পৃথগ্ ভাবমেকস্থ মনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ ৩১

সান্বয়ব্যাখ্যা। যদা (যস্মিনকালে) ভূত পৃথক্‌ভাব (ভূতানাং স্থাবর-জঙ্গমানাং ভেদং পৃথক্‌ত্বম্) একস্থং (প্রলয়ে একস্মিন্ আত্মনিস্থিতম্) অনুপশ্যতি (আলোচয়তি আত্মা ইব ইদং সর্ব্বং পশ্যতি) তত এব চ (তস্মাদেব) বিস্তারং (ভূতানাং পৃথক্‌ভাব (সৃষ্টিকালে অনুপশ্যতি) তদা (তস্মিনকালে ভূতানামপি ভেদদর্শনাভাবাৎ) ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (ব্রহ্মৈব ভবতি) ৩১

বঙ্গানুবাদ। প্রাণীসমূহের পৃথক্ পৃথক্‌ভাব যখন এক আত্মাতেই দর্শন করেন এবং এক হইতেই ভূত সকলের বিস্তারও দর্শন করেন তখন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন। ৩১

আলোচনা। এক আত্মাতেই পৃথক্ পৃথক্ ভূতরূপে পরিদৃশ্যমান সমস্ত ভূতই প্রলয়কালে এক আত্মাতেই বিলীন হয়, আবার সৃষ্টিকালে সেই সকল ভূতই প্রকৃতি বা ভগবৎ মায়ায় নানাআকারে পরিদৃশ্যমান হয়, যিনি জ্ঞান-বলে ইহাকে প্রকৃতির স্বরূপ মাত্র ভূত সকলে অভেদদর্শী হন তিনিই ব্রহ্ম-ভাব প্রাপ্ত হন। ৩১

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ৩২

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে কৌন্তেয়! অয়ং পরমাত্ম অনাদিত্বাৎ (আদিকারণং তৎ যস্য নাস্তি তৎ অনাদি) নির্গুণত্বাৎ (সত্ত্বাদিগুণাতীতত্বাৎ) অব্যয়ঃ শরীরস্থোঽপি ন করোতি (ন কিঞ্চিৎ করোতি) ন লিপ্যতে (ন চ কর্ম্মফলেন লিপ্যতে। ৩২

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! অনাদি ও নির্গুণ বলিয়া পরমাত্মা অব্যয় শরীরস্থ হইয়াও শরীরের সহিত লিপ্ত হয়েন না। ৩২

আলোচনা। আত্মার কখন উৎপত্তি নাই, এজন্য তিনি অনাদি এবং তিনি সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণের অতীত এজন্য নির্গুণ। নির্গুণ বলিয়া প্রাকৃতিক কোন নিয়মের অধীন নয় তাহার জন্ম-মরণ কোন বিকার না থাকায় তিনি অব্যয়। শরীর ধর্ম্মের সহিত শরীরস্থ আত্মার কোন সংস্রব নাই এজন্য আত্মা নির্লিপ্ত শরীরের কোন কৃতকার্য্যের জন্য আত্মার কোন সম্বন্ধ না থাকায় আত্মা কর্ম্মফলে লিপ্ত নহেন। ৩২

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ ৩৩

সান্বয়ব্যাখ্যা। যথা সর্ব্বগতং (সর্ব্বব্যাপি জল পঙ্কাদিষপি স্থিতং) আকাশং সৌক্ষ্ম্যাৎ (সূক্ষ্মভাবাৎ অসঙ্গ স্বভাবাৎ পঙ্কাদিভিঃ) ন উপলিপ্যতে তথা সর্ব্বত্র (উত্তমে অধমে ন দেব মনুষ্যাদৌ) দেহে অবস্থিত আত্মা ন উপলিপ্যতে (দেহিকৈর্দ্দোষ গুণৈর্নযুজ্যতে) ৩৩

বঙ্গানুবাদ। যেমন সর্ব্বব্যাপী আকাশ সর্ব্ব বস্তুতে থাকিয়াও সূক্ষ্মবশতঃ কিছুতেই লিপ্ত হয় না। সেইরূপ আত্মা সর্ব্বদেহে থাকিয়াও নির্লিপ্ত। ৩৩

আলোচনা। আত্মা শরীরস্থ থাকিয়াও কি প্রকারে নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব তাহার একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। যেমন আকাশ সর্ব্বত্র অবস্থিত থাকিয়াও অতি সূক্ষ্মত্বহেতু কোন বস্তুর সহিত তাহার লিপ্ততা নাই, সেই রকম আত্মাও সকল প্রাণী শরীরে থাকিয়া তাহার সূক্ষ্মতা ও অসঙ্গত্বহেতু শরীরে কোন প্রকার কিছুমাত্র লিপ্ত হয় না। ৩৩

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোক মিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ ৩৪

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে ভারত যথা একঃ রবিঃ ইমং কৃৎস্নং (সর্ব্বং) লোকং প্রকাশয়তি তথা ক্ষেত্রী (পরমাত্মা) কৃৎস্নং (সর্ব্বং) ক্ষেত্রং প্রকাশয়তি। ৩৪

বঙ্গানুবাদ। এক সূর্য্য যেমন সকল লোককে প্রকাশ করেন সেইরূপ এক ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ পরমাত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন। ৩৪

আলোচনা। একই পরমাত্মা কি রকমে সকলদেহে নির্লিপ্তভাবে থাকিতে পারেন তাহা উদাহরণ স্বরূপে বলিতেছেন যেমন এক সূর্য্য সকল পদার্থের প্রকাশক হয়েন তেমন এক পরমাত্মা সর্ব্বজীবদেহে অবস্থিতি করেন। ৩৪

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োরেব মন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূত প্রকৃতি মোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥ ৩৫

সান্বয়ব্যাখ্যা। এবং (যথোক্ত প্রকারেণ) ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ অন্তরং (ভেদং) ভূতপ্রকৃতি মোক্ষঞ্চ (ভূতানাং সর্ব্বেষাং প্রকৃতিঃ তস্যা সকাশাৎ (মোক্ষেপয়ং ধ্যানাদিকঞ্চ) জ্ঞানচক্ষুষা (আত্মজ্ঞানরূপেণ চক্ষুষা) যে বিদুঃ (বিজানন্তি) তে পরং (কৈবল্যং) যান্তি (গচ্ছন্তি) ৩৫

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বোক্তরূপে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এবং ভূতগণের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায় যাঁহারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জানিতে পারেন তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হন। ৩৫

আলোচনা। যাহারা এই অধ্যায়ের কথিত পূর্ব্বোক্তরূপে ক্ষেত্ররূপ দেহকে

জড় ও বিকারযুক্ত এবং ক্ষেত্রজ্ঞরূপে পুরুষকে চেতন অকর্ত্তা ও অবিকারী বলিয়া জানেন এবং যিনি আত্মজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা মায়ার সম্পূর্ণ উপশম করিতে পারেন তিনি পরমপদ প্রাপ্ত অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ৩৫

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাশগুপ্ত।

আত্মতত্ত্বে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট (M. A.) ক্লাসের পাশ্চাত্য দর্শনের নূতন বিভাগের একমাত্র ছাত্র শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ ধরের সহিত লেখকের যে আলোচনা হয় নিম্নে তাহার অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

দার্শনিক—যখন মনে হয় যে এটা আমার হাত এটা আমার আঙ্গুল, এখানটা ফুলিয়াছে এখানে বেদনা হইয়াছে, তখন দেহ ছাড়া আর একটা কিছু এই সকল বিচার করিতেছে। বিচার করিতেছে কে? মন, বা আত্মা বা এইরূপ আর যে নাম দেওয়া হউক্ না কেন। বিচার করিতেছে কাহার? দেহের। বিচারক বিচারিত বস্তু হইতে পৃথক্. অর্থাৎ বিচারক স্বতন্ত্র ব্যক্তি না হইলে আর একজনের বিচাকর হইতে পারে না। এক্ষণে বিচারক মন বিচার করিতেছে দেহের, সুতরাং মন দেহ হইতে পৃথক্, বিচারক মন যদি দেহ হইতে পৃথক্ হইতে পারে তবে দেহকে পরিত্যাগ করিয়া মন থাকিতে পারিবে না কেন? অতএব সিদ্ধান্ত হইল এই যে দেহের পতন হইলে মন বা আত্মার স্থিতি অসম্ভব এরূপ কল্পনা করিবার কোন কারণ নাই।

বৈজ্ঞানিক—কারণ যথেষ্ট আছে, তুমি যাহা বলিলে তাহা সম্পূর্ণ কল্পনাত্মক (Theoretical)। ইউক্লিডের Point এর ন্যায় উহা মানিয়া লইলেও সুস্পষ্ট (Definit) মিমাংসা নহে। Point is that wich has position but no magnitude কাগজে ছাত্র যখন পেন্সিল দিয়া বিন্দু অঙ্কিত করে তখন তাহার আয়তন বা অবয়ব নাই, কেমন করিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে? বিন্দু যতই ক্ষুদ্র হউক্ না কেন যখন তাহার অবস্থান আছে তখন তাহার আকারও আছে। একজন প্লীহারোগীর প্লীহা হইতে যন্ত্রযোগে একবিন্দু রস (Serum) লইয়া অণুবীক্ষণের দ্বারা দেখিলে উহাতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট দেখিতে

পাওয়া যায় উহারা লোকচক্ষুর অগোচর ও যতই ক্ষুদ্র হউক্ না কেন, অণুবীক্ষণে উহাদিগকে শুধু দেখিতে পাওয়া নয় উহাদের আকার প্রকার সমস্তই বুঝিতে ও মাপিতে পারা যায়, উহাদের বংশ বৃদ্ধি প্রতি মিনিটে কত গুলি করিয়া তাহাও বেশ গুণিতে পারা যায়। যখন অত ক্ষুদ্র কীটের সম্বন্ধে আমরা এত জানিতে পারি তখন উহাদের Position ও magnitude দুই আছে তাহাতে কি সংশয় থাকিতে পারে? তবে ঐ ক্ষুদ্র কীট হইতে বহু গুণে বড় বিন্দুটীর Position আছে আর magnitude নাই ইহা কি বাতুলের প্রলাপ নহে? তথাপি আমাদিগকে কার্য্যের অনুরোধে মানিয়া লইতে হইবে যে A point is that wich has position but no magnitude সেইরূপ কার্য্যের অনুরোধে মানিতে হইবে যে দেহ ও মন (আত্মা) পৃথক্, দেহের অবশানে মন বা আত্মার অবস্থিতি সম্ভব, কিন্তু সম্ভব এই পর্য্যন্ত, প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই।

যে বিজ্ঞানের ভিত্তি Theoryর উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিজ্ঞান চরম উন্নতি লাভ করে নাই, তোমাদের Idealism এর অবস্থাও ঠিক্ সেই প্রকার। দেহ ও মন বা আত্মা সম্বন্ধে তোমরা আজ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছ কালগতে তাহা হয়ত আর থাকিবে না, নবযুগের আবির্ভাবে নূতন চিন্তা প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে পরিশোধিত হইয়া উহা যে আবার নূতন আকারে গড়িয়া উঠিবে না তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা, যাহা দেখাইয়া দেওয়া যায় তাহাতে কোন সংশয় থাকিতে পারে কি? জ্যোতিষ (Astronomy) যখন Theoryর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন লোকে কল্পনা করিত, চন্দ্র ও সূর্য্য কেন্দ্রস্থ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। যখন জ্যোতিষের উপাদান Theory ছিল তখন যে কতবার কত মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, টলেমীর প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি কোপর্নিকসের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি, টাইকোব্রার প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি সমূহ তদানিন্তন যুগে জ্যোতিষের ক্রমোন্নতির যুগ বলিয়া পরিগণিত ছিল। তৎপরে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ গ্যালিলিও জন্ম গ্রহণ করিয়া জ্যোতিষশাস্ত্রের যে সকল পদ্ধতি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন আজিও পর্য্যন্ত তাহার আর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া দেখাইলেন যে চাঁদের কলঙ্ক, চাঁদের মা বুড়িও নহে কৃষ্ণশায়ী মৃগও নহে, উহা উত্তুঙ্গ শৈলমালার মধ্যে গভীর গহ্বর ও কঙ্করময় নিম্ন ভূমি। চন্দ্র নিজে জ্যোতির্ম্ময় নহে

সূর্য্যের আলোকে প্রতিভাত হয়। সূর্য্য চন্দ্র কর্ত্তৃক আবৃত হইলে এবং চন্দ্র ভূ-ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিলে গ্রহণ হয়। পঠদ্দশাতেই, এরিষ্টটলের প্রবর্ত্তিত দর্শনশাস্ত্র নিতান্ত যুক্তি বহির্ভূত বলিয়া তাঁহার প্রত্যয় জন্মিয়াছিল। তখন লোকের ধারণা ছিল নিম্নাভিমুখে পতিত হালকা ও ভারি বস্তুদ্বয়ের মধ্যে ভারি বস্তু আগে ভূপতিত হয়। গালিলিও পাইসানগরের প্রধান দেবালয়ের চূড়া হইতে বারম্বার পরীক্ষা করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে গুরুত্ব অধঃপতনের নিয়ামক নহে। বায়ু বিহীন স্বচ্ছনলের ভিতর একটী পালক ও সমান আকারের অথচ তদপেক্ষা ভারি একখণ্ড সীসক একত্রে ছাড়িয়া দিলে দেখা গেল যে ঠিক্ একই সময়ে উভয়েই নলের তলদেশে পতিত হইল। বায়ুর প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত উন্মুক্ত স্থানে উহাদের পতনের কালের তারতম্য হইয়া থাকে। ইঁহাতে এরিষ্টটলের মতাবলম্বিরা তাঁহার বিপক্ষ হইয়া উঠে, এবং ১৬৩৩ খৃঃ অঃ রোমনগরের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক তিনি কঠোর দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হন; গ্যালিলিও তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন তিনি সে সময়ে মনের দৃঢ়তা রাখিতে না পারিয়া বাইবেল হাতে করিয়া বলিয়া ছিলেন—"আমি পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছি তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও অশ্রদ্ধেয়," কিন্তু পর মুহূর্ত্তে জ্ঞান ও বিশ্বাসের বিপরীত কর্ম্ম করিলাম মনে করিয়া ঘৃণা সহকৃত রোধে পৃথিবীতে পদাঘাত করিয়া বলিয়া ছিলেন—"ইহা এখনও চলিতেছে"। গ্যালিলিওর জীবিতকালের মধ্যে কেপলার পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া ছিলেন যে সূর্য্য কেন্দ্রস্থলে বিদ্যমান তৎপরে বুধ, শুক্র, সচন্দ্রপৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনৈশ্চর যথাক্রমে দূরে থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, গ্রহগণের গতির পথ গোলাকৃত নহে ডিম্বাকৃতি ইত্যাদি। তৎপরে সার্আইজাক্ নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়া গ্রহগণের গতি ও বল বিজ্ঞান, ধূমকেতুর কক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের যে সকল মিমাংসা করিয়া গিয়াছেন তাহা আজিও জ্যোতিষশাস্ত্রে মুখ্যপদবাচ্য হইয়া আছে। তিনি, খৃষ্টের জন্মের দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে হিপার্কাসের আবিষ্কৃত Precession of the equinone সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণে কেবলমাত্র পৃথিবীর জল ভাগ উচ্ছ্বসিত হইয়া জোয়ার ভাঁটার সৃজন করে তাহা নহে, পৃথিবীর কঠিন ভূমিভাগও উহাদের আকর্ষণে বিচলিত হয়, এবং ভূপৃষ্ঠের স্থাবর-জঙ্গম যাবতীয় পদার্থই উহাদের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে পৃথিবীর বিষুব প্রদেশের ভূমিভাগ স্ফীত হইয়া উঠার ফলেই Precession of the

equinone (ক্রান্তিপাতের পশ্চাৎ গতি) ঘটিয়া থাকে। জ্যোতিষের এই সকল প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সত্য যে কোন কালে ভিন্ন মত ধারণ করিবে ইহা ত মনে হয় না।

জ্যোতিষের কোন কোন বিষয় এখনও Theoryর উপর নির্ভর করিয়া প্রতিষ্ঠিত আছে, যেমন বহুরূপী ও নবতারা (Veriable stars and Novae) সম্বন্ধীয় মত। এ বিষয়ে জ্যোতিষশাস্ত্র এখনও শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নাই কেহ কোন প্রকার যন্ত্রের দ্বারা দেখাইতে পারেন নাই ঠিক্ কি কারণে বহুরূপী তারার জ্যোতির হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে ঠিক্ কি কারণে জ্যোতিষ্ক বিহীন নীলাম্বরে সময়ে সময়ে নূতন তারা ফুটিয়া উঠে এবং কেনই বা উহারা কিছুদিন পরে আবার অদৃশ্য হইয়া যায়। সুতরাং এই সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত সমূহ কার্য্যের অনুরোধে মানিয়া লইলেও অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া পরিগণিত নহে। সুতরাং মন যখন দেহের বিচারক তখন দেহ হইতে পৃথক্ ইহা কার্য্যের অনুরোধে মানিয়া লইলেও দেহের পতনে মনের বিদ্যমানতা অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া মানিতে পারা যায় না।

দার্শনিক—ক্রোধ, শোক, ঘৃণা প্রভৃতি একেবারে মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, মনই ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠে শোকে অভিভূত হয়, সুতরাং মন যখন ইহাদের আধিপত্যের বিষয়ীভূত কোন জিনিষ তখন উহাকে দেহ হইতে পৃথক্ স্বীকার না করিবার হেতু কি?

বৈজ্ঞানিক—মনের স্বতন্ত্র সত্ত্বা নাই উহা দেহের একটা গুণমাত্র, উহাকে চৈতন্য বা Activity of nervuss বলা যায়। স্নায়বীক উত্তেজনার সাড়াই চৈতন্য বা মন। মন তন্তুময় দেহের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াই যখন ক্রোধে উত্তেজিত হয় তখন "ক্রোধে তনু কাঁপে থর থর।" মন যদি দেহ হইতে স্বতন্ত্র হইত তাহা হইলে তনুর কাঁপিবার কারণ থাকিত না। মন শোকে অভিভূত হইলে দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িত না। মানবদেহ বিশ্লেষণ করিয়া মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় কতকগুলি, কোষময় তন্তু ও যন্ত্র এবং উহাদের সাড়াই চৈতন্য। যন্ত্রের ক্রিয়া লোপ হইলে চৈতন্যও লোপ পায় * সুতরাং মনই বল আর আত্মাই বল

* চৈতন্য লোপ পায় কিন্তু ধ্বংশ হয় না। যেমন, একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে উহাকে নিবাইয়া দিলে উহার শিখা (flame) লোপ পায় মাত্র, ধ্বংশ হয় না। আমরা যে অগ্নিশিখা দেখিতে পাই, তাহা, অত্যুষ্ণ বাষ্প মাত্র।

কিছুই থাকেনা। ইতরজীবের সহিত তুলনায় দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের দেহ ও দেহাভ্যন্তর্গত যন্ত্রের ক্রিয়ার সহিত মানবের একটীমাত্র বিষয়ের পার্থক্য ব্যতীত অন্য কোন পার্থক্য নাই। ইতরজীবের ক্ষুৎপিপাসা, ভয় ক্রোধ প্রভৃতি সমস্তই আছে—নাই কেবল সেই জিনিষটী যাহা দ্বারা মানুষ জ্ঞানের উন্নতি করিতে পারে। সে জিনিষটী অসাধারণ হইলেও অস্বাভাবিক নহে এবং উহা মানবদেহের একটী উন্নততর যন্ত্র মস্তিষ্কের বিশেষ বৃত্তি (Faculty) ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু এই বৃত্তি থাকা সত্বেও দেখা যায় শিক্ষার অভাবে অনেক মানব পশু ধর্ম্মাক্রান্ত তাহাদের জ্ঞানের উন্নতি হয় না, তাহারা অতি নিকৃষ্টভাবে জীবিত থাকিয়া কালাতিপাত করে; আবার শিক্ষার প্রভাবে অনেক ইতরজীব মানুষের ন্যায় জ্ঞানের পরিচয় দিয়া থাকে। যদি মস্তিষ্কের ঐ বৃত্তিকে মন বা আত্মা বলা যায় তাহা হইলে পশুর কি আত্মা নাই? যদি থাকে তবে তাহার আত্মা পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গে যায় এরূপ বর্ণনা কোন গ্রন্থে নাই কেন? মানবজাতীর যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থে নরকের বা স্বর্গের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে গো, অশ্বাদির নরক বা স্বর্গভোগের কোন বর্ণনা নাই কেন? অতএব মানুষের মন বা আত্মা একটা কল্পনা মাত্র (Conception) প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই।

বস্তুতত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সংযোগ ও বিয়োগ (composition and decomposition) প্রকৃতির—বস্তুর—ধর্ম্ম। বস্তু—Matter—(জড়) সংযুক্ত (conceutet) হইয়া আকার প্রাপ্ত হয়, আকার শক্তিযুক্ত হইলে প্রাণময় হয়, তাই শক্তিযোগে শিবসংজ্ঞা শক্তিলোপে শব।” প্রাণ, ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে—by the act of evolution যতই উন্নততর যন্ত্রে আশ্রয় পাইতে থাকে ততই জ্ঞানের বিকাশ করিতে থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কোষময় তন্তু ও যন্ত্রের সাড়াই প্রাণ বা চৈতন্য।) অতএব জড়ে ও চৈতন্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যেখানে জড় সেখানেই চৈতন্য, যেখানে

oxygen hydrogen প্রভৃতি কতিপয় বায়বীয় পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে ও চাপে (under pressure) ঐ শিখা উৎপন্ন হয়, চাপ অপনীত হইলে রাসায়নিক বিশ্লেষণে ঐ শিখা অন্তর্হিত হয়, কিন্তু oxygen, hydrogen প্রভৃতি বায়বীয় পদার্থ গুলি অতি নশ্বর, উহারা অন্তরীক্ষে, লোকচক্ষুর অগোচরে বিদ্যমান থাকে, এবং অনুকূল অবস্থায় পুনর্ব্বার শিখা-বিকাশ করে। ঠিক্ এই কারণে চৈতন্য বা আত্মায় অবিনশ্বরতা, ও জন্মান্তর স্বীকার করিতে বৈজ্ঞানিক কুণ্ঠিত নহে।

চৈতন্য সেখানেই জড়, তাই প্রকৃতিতে পুরুষের মিলন মহান্।" এই জন্যই বৈজ্ঞানিক ধাতু, প্রস্তর, মৃত্তিকা, বৃক্ষ, গুল্ম ইতরজীব ও শ্রেষ্ঠজীবে কোন পার্থক্য দেখিতে পান না।

সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে হে প্রকৃতি! তুমি
রাখিয়াছ নিজতত্ত্ব অজ্ঞান নরের।
শুধু উপাসক তব, আরাধি তোমারে,
তাপস যেমতি তুষি, ইষ্টদেবতায়,
লভে কভু কাম্য বর। কে জানিত বল,
আশ্লেষণে, বিশ্লেষণে, তাপে, শৈতে, চাপে
রূপ, রস, গন্ধে তুমি দেখাও প্রভেদ।
বুঝিয়াছে তত্ত্ব তব প্রসাদে তোমার,
জড় নহে জড়মাত্র, ক্রিয়াসংজ্ঞাহীন;
আছে অনুভূতি তার, পারে প্রকাশিতে
চেতনা, বেদনা নিজ অস্ফুটভাষায়।

শিবাজীমহাকাব্য (চতুর্দ্দশ সর্গ)

মাটিতে একটী বীজ পড়িলে, সে প্রকৃতি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে অঙ্কুর বিকাশ করে তাহাতে পত্র শাখা কাণ্ড প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, এবং ফুল ও ফলে সুশোভিত হয়, বলিতে পার বীজের মধ্যে অঙ্কুর ও অঙ্কুরের মধ্যে পত্র শাখা কাণ্ড ফুল ও ফল লুক্কায়িত ছিল, সুযোগ পাইয়া আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। বেশত সুযোগ না পাইলে কে আত্ম প্রকাশ করিতে পারে? আচ্ছা, একখানি পরিচ্ছন্ন প্রস্তর অথবা শান বান্ধান প্রাঙ্গন উন্মুক্ত আছে, বর্ষাকালে তাহার উপর ক্রমাগত বৃষ্টি পড়িতেছে, বৃষ্টি পড়িতে পড়িতে একদিন দেখা গেল তাহার উপরিভাগ ঈষৎ মলিন হইয়াছে, ক্রমে দেখা গেল উহাতে দাগ ধরিয়াছে ক্রমে দাগ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া সবুজ বা কৃষ্ণবর্ণের আকার ধারণ করিয়াছে এবং ঈষৎ পুরু হইয়া স্পর্শানুভব জন্মাইতেছে; বলা বাহুল্য উহাকে আমরা "ছেদলা পড়া" বা "ছাতা ধরা" বলি। অনুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐ ছেদলা পড়া স্থানটী একটী বৃহৎ অরণ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। "ছেদলার" প্রতিকেশর এক একটী কোষময় প্রাণময় উদ্ভিদ ব্যতিত আর কিছুই নহে। ওখানে ত কোন বীজ ছিল না, ওখানে কিছুরই কোন অস্তিত্বই ত ছিলনা;

তবে ঐ 'ছেদলা'—ঐ অরণ্যানী কোথা হইতে আসিল; ঐ ছেদলাই বিবর্ত্তনের ফলে আরও একটু বড় হইয়া শৈবাল, আরও একটু বড় হইয়া তৃণ, আরও একটু বড় হইয়া শাক সব্জি, আর ওষধি, লতা, গুল্ম, ক্ষুদ্র পাদপ ও পরিশেষে বনস্পতির পদে উন্নতি লাভ করে।

জলের পোকা সকলেই দেখিয়াছেন, বিশুদ্ধ পরিশ্রুত (filtered) জল- যাহাতে কীটের (Germs or bacilli) অস্তিত্বের সম্ভাবনা আদৌ কল্পনা করা যায় না, উন্মুক্ত রাখিয়া দিলে কিছুদিন পরে দেখিতে পাওয়া যায় যে জলের মধ্যে স্থানে স্থানে ঈষৎ ঘন বোধ হইতেছে' আরও কতিপয় দিন পরে দেখাযায় ঐ ঘন স্থান একটু লালাবৎ হইয়াছে, ক্রমে দেখা যায় ঐ লালাবৎ পদার্থের কেন্দ্রস্থলে একটী কৃষ্ণ বিন্দুর আবির্ভাব হইয়াছে, দেখিতে দেখিতে ঐ কৃষ্ণ বিন্দুটী কোষময় প্রাণময় হইয়া উঠিবে আর উহার চতুর্দ্দিকের ঐ লালাবৎ আবরণ (Albumen.) উহাকে সতত রক্ষা করিতে নিযুক্ত থাকিবে। এ জীবের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? ইহা কি বস্তুর বা পরমাণুর অথবা তদপেক্ষা সূক্ষ্মতম পদার্থ যাহা অধুনা বৈজ্ঞানিক জগতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সংযোগ (Composition) ধর্ম্ম ফল নহে? রেডি, হেল্মহোল্টজ্, প্যাষ্টিউর, টিণ্ডল * প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ দুই শতাধিক বৎসরকাল কঠোর পরীক্ষার পর স্থির করিয়াছেন যে বায়ুতরঙ্গে ভাসমান ধূলীকণারূপী জীবাণু হইতে ঐ প্রকার স্বেদজ জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঐ জীবাণুই ত জড়

* Frances Redi (1626-98) M. D, and a physeccean tothe court of Tuscany. His refutation of the theori of spontaneous generation (obiogenesis) and his experements in the circulation of blood were valuable contribution to Biology. Hermann ludvig ferdenaud von Helmhaltz (1821-94) a german philosopher and a scientist. He became surgeon in the Prussian army in 1842. He wrote a thesis in which he announced the discovery of nerve cells in ganglia. Loues posteur (1822-95) an eminent pathologist and the discoverer of anti rabid treatment by inoculating fluid from the spined cord of a deseased dog. John Tyndall (1820-93) published floating matters of the Air in 1881 Joseph Lord Lister (1827-1912.) British surgeon and the descoverer of the Anticeptic system of treatment.

চৈতন্যের অবিভাজ্য সত্তা অথবা বৈজ্ঞানিক আত্মা (Indivisible matter) প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া কীটটী যখন গড়িয়া উঠিয়াছিল, যখন কেবল কৃষ্ণ বিন্দুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল তখনও উহা নিস্পন্দ ছিল পরে উহাতে শক্তি আরও সংযুক্ত concentrate) হইলে উহা প্রাণময় হইয়া স্পন্দিত হইয়া উঠিল। এবং ক্রমে ছুটাছুটী আরম্ভ করিল। ঐ প্রকার জলের পোকা হইতে কৃমি, পরে মশক বোলতা রেশমকীট, শাক ও শস্য ধ্বংশকারী বহুবিধ কীটের উৎপত্তি ক্রম বিবর্ত্তনের ফল বলিয়া কীটতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন। এবং এই প্রকার ক্রম বিবর্ত্তনের ফলে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষেরও উৎপত্তি হইয়াছে। চৈতন্যও ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর যন্ত্রের আশ্রয় পাইয়া অবশেষে মানুষের মস্তিস্ক (Perffectbrain) আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

উদ্ভিদ প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নিজ দেহ মধ্যে জীবের পরিপুষ্টি সাধক protoplusm তৈয়ারি করে উদ্ভিদ ব্যতীত অন্যত্র protoplusm তৈয়ারি হয় না। protoplusm জীবের একমাত্র মূল পদার্থ। প্রাণী মাত্রেই উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পদার্থ ভোজন করিয়া নিজের দেহে protoplusm সঞ্চয় করিয়া জীবিত থাকে। ফলতঃ আমাদের আহার্য্য দ্রব্য দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিপাক হইয়া রস, রক্ত, মেদ, মাংস মজ্জা, অস্থি প্রভৃতিতে পরিণত হইয়া দেহকে সঞ্জীবিত ও পুষ্ট রাখে। দেহাভ্যন্তরে ঐ সমস্ত বস্তু সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর রসে পরিশোধিত হইয়াও সংগঠনি শক্তি বলে কেন্দ্রীভূত (cocentrate) হইয়া জরায়ুজ ও অণ্ডজ জীবের নিদান sparmetrojoasএ পরিনত হয়, ঐ sparmetrojoas যন্ত্রযোগে উপযুক্ত পাত্রে নীত হইয়া রাসায়নিক প্রকৃয়ায় জীবদেহ গঠিত করে. ও পরে শক্তিযোগে প্রাণময় বা চৈতন্যযুক্ত হইয়া উঠে। বৈজ্ঞানিক এবম্বিধ জীবোৎপত্তিকে দেহান্তরবাদিরা পুনর্জ্জন্ম বলিতে কুণ্ঠিত নহেন। যেহেতু সন্তান (সম+তন (তনু)+ ঘঞ) তনয় (তন (তনু)+ কয়ম্) আত্মজ (আত্মন্ + জন + ড) প্রভৃতি ইহার সমর্থন করিবে।

যেমন সংগঠনি শক্তি (centripetal force) বস্তুকে সংহত (concentrate) করিয়া নিয়ত সৃজন কার্য্যে রত আছে, তেমনই সংহারিণী শক্তি (centrifugal force) বস্তুকে বিশ্লিষ্ট (dissolve) করিয়া নিয়ত ধ্বংশ কার্য্যে রত আছে। সারাবিশ্বে প্রতিনিয়ত এই সৃজন ধ্বংশের লীলা চলিতেছে।

ফলতঃ অবস্থার পরিবর্ত্তন ব্যতীত জগতে নূতন সৃষ্টি বা চরম বিনাশ নাই। বস্তুর (Matter) অবস্থিতি কল্পনা করিতে হইলে তাহার আশ্রয় চাই। ব্যোম বা কারণার্ণব (The eathereal sky) তাহার আশ্রয়; মহাশক্তি বস্তু লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন তাঁহারও আশ্রয় চাই, শাশ্বত কাল তাঁহার আশ্রয়। কালকে আশ্রয় করিয়া—মহাকালের বক্ষে—মহাকালীর নৃত্যই ও বিশ্বের প্রাণ—The life of the universe.

তাই প্রকৃতির একনিষ্ঠ সাধক ঐ মহাশক্তিকে "তুরীয় চৈতন্যরূপা বেদের অতীতা" চিন্ময়ী জগদ্ধাত্রীরূপে পূজা করিয়া থাকেন।

"কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণাম প্রদায়িনি!।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তি নারায়ণি! নমোঽস্তুতে ॥ ৯ ॥
*   *   *   ॥ ১০ ॥
সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি!।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি! নমোঽস্তুতে ॥ ১১ ॥

অন্যত্র।

হেতুঃ সমস্ত জগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈর্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশ ভূতমব্যাকৃতাহি পরমা প্রকৃতি স্ত্বমাদ্যা ॥ ৫ ॥
(মার্কেণ্ডেয় চণ্ডী)

আর যাহাকে আশ্রয় করিয়া চিন্ময়ীর বিকাশ সেই মহাকালকে সচ্চিদানন্দ পুরুষ বা জ্ঞানময় ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন।

ত্বমক্ষরং পরমং (ব্রহ্ম) বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং (আশ্রয়ঃ)।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্ম (জনন মরনাদি) গোপ্তা, সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতোমে ॥ ১৮ ॥
*   *   *   *
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্! গরীয়সে ব্রহ্মণোপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত! দেবেশ! জগন্নিবাস! ত্বমক্ষরং (ব্রহ্ম) সদসৎ (ব্যক্তং, অব্যক্তং) তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

অন্যত্র।

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্বং স্থাবরজঙ্গমং।
ক্ষেত্র (জড়) ক্ষেত্রজ্ঞ (চৈতন্য) সংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ! ॥ ২৬ ॥ *

* ক্ষেত্র, জড় বা প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ, চৈতন্য বা পুরুষ পরস্পরের

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭ ॥

শ্রীমদ্ভগবগীতা।

আত্মা যখন এই অনন্ত জগতের সর্ব্বত্রই সংযুক্ত বা অভিসম্বন্ধ আছে তখন প্রত্যেক জীবদেহের মধ্যেও অনুসূত আছে এবং তাহাদ্বারাই প্রকাশিত হইয়া প্রত্যেক দেহবর্ত্তী মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ চেতন ভাবে আপনাপন কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, আপনাপন অস্তিত্বের অনুভব করিতেছে, আর প্রত্যেক জীব আপনার চৈতনতা অর্থাৎ "আমি চেতন বা চৈতন্য বিশিষ্ট পদার্থ" এইরূপ অনুভব করিতেছে। সুতরাং সকলেই যে ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি প্রভৃতির সঙ্গে সেই চৈতন্য পদার্থেরও অনুভব করিতেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু এবম্বিধ আত্মা দর্শন বা ব্রহ্ম দর্শনের দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না। যেহেতু ঐ প্রকার আত্মজ্ঞান পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি সকল প্রাণীরই আছে, তাহারাও আপনাকে চেতন পদার্থ বলিয়া অনুভব করে, * অতএব উহাকে আত্মদর্শন বলে না। পরন্তু যাঁহারা চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে (বৈজ্ঞানিক আত্মা বা indivisible matter) সর্ব্বত্র সমভাবে দেখিতে পান, ব্রহ্মা অবধি কীট পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রাণীতে এবং স্বর্গ অবধি মলমূত্রাগার পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্থানের প্রত্যেক পদার্থে অবিকৃত ও ন্যূনাধিক্য রহিত ভাবে দেখিতে পান, প্রাণীদেহ এবং অন্যান্য ভূত ভৌতিক পদার্থ কোন প্রকারে পরিবর্ত্তিত বা বিনষ্ট হইলেও আত্মাকে (matter) অপরিবর্ত্তিত ও অবিনশ্বর অবস্থায় দেখিতে পান, তাঁহারাই আত্মাকে দর্শন করেন বলিয়া জানিবে ॥ ২৭ শ্লোকের অর্থ ॥

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র।

কিরূপে মিলিয়া থাকে তাহার বিশদব্যাখ্যা শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবদগীতার ২৬৮ ও ২৬৯ পৃষ্ঠায় ফুট নোটে দেখুন।

* গো অশ্বাদি ইতরপ্রাণীর আত্মা থাকিলেও মস্তিষ্কের অপূর্ণতাপ্রযুক্ত তাহাদের আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন হয় না, তজ্জন্যই পূর্ব্বসূরিগণ তাহাদের স্বর্গ বা নরকভোগের কোন কল্পনা করেন নাই।

ভক্তিকথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কেহ তর্ক করিয়া জীবন নষ্ট করে, কেহ বা বাঞ্ছিত ধন পাইয়া চরিতার্থ হইয়া শান্তচিত্তে আনন্দানুভব করে। মন প্রাণ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, এইগুলি লইয়া আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। মনের কতগুলি ধর্ম্ম আছে এবং মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরিচালক। আত্মা সুখদুঃখাতীত হইলেও পঞ্চকোসাত্মক দেহ-গেহে মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া দেহ মনের অনুভূত সুখদুঃখাদি নিজের বলিয়া সুখদুঃখাভিমানী হইয়া হর্ষ বিষাদ অনুভব করিতেছেন এবং জন্ম মরণ প্রাক্তন কর্ম্মবশে ভ্রান্তবৎ ধাবিত হইতেছেন। পরমাত্মা নিয়ন্তা, যন্ত্র বৎ কর্ম্মানুযায়ী ফলানুসারে নির্দ্দিষ্টপথে পরিচালিত করিতেছেন। তজ্জন্য তিনি দোষী নহেন, তিনি ফলজনয়িতা নহেন, নিয়ন্তা মাত্র। পরমেশ্বরই সুখ দুঃখ বিধান করিতেছেন—বলিলে জগতের বৈষম্যের জন্য তিনি দোষী নির্ণীত হন। বিবিধ অসামঞ্জস্য পরিহারার্থ শাস্ত্রকারগণ সৃষ্টি ধারা অনন্ত, মায়া অনাদি জীবের কর্ম্মাদৃষ্টও অনন্ত, বিশ্ব অনন্ত স্বীকার করিয়া দোষমুক্ত হইয়াছেন। সুতরাং আর কেহই ভগবানের স্কন্ধে দোষ চাপাইতে পারেন না। দোষীকে কারারুদ্ধ করায় ও নির্দ্দোষীকে ছাড়িয়া দেওয়ায় বিচারকের অযশ বা সুখ্যাতি নাই। তিনি আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন এইটুকু মাত্র বুঝা যায়। জীবের কর্ম্ম অনাদি হইলেও শান্ত, কারণ "ক্ষীয়ন্তেচাস্য কর্ম্মাণি" ইত্যাদি প্রমাণ-বলে বুঝা যায় যে জ্ঞান বা ভক্তিপ্রভাবে কর্ম্ম নাশ হয়। তাহা স্বীকার না করিলে মুক্তি অশ্বডিম্বতুল্য হইয়া উঠে। সুতরাং মুক্তির জন্য কর্ম্মফলের নশ্বরত্ব স্বীকার করিতে হইবে। সৎকর্ম্ম জন্য নিয়ন্তা সুফল বিধান করেন, সুতরাং তাঁহার প্রীতি-সাধন কর্ম্মই সুখপ্রদ ও ইন্দ্রিয়, মন, আত্মার তৃপ্তি-জনক। সুতরাং শাস্ত্রকারগণ সেই সমস্ত কর্ম্মই সৎকর্ম্মনামে ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন। তদিতর কর্ম্ম দুঃখপ্রদ ও প্রবাহরূপী সংসাররূপ-কারাগারে যাতা-য়াতের হেতুভূত। এই মীমাংসা বলে বুঝিতে পারা যায়, ভগবৎ আরাধনার অবশ্য কর্ত্তব্যতা আছে। ধনের আবশ্যক নাই, মাত্র মন দিয়াই যাঁহাকে পাওয়া যায়, সর্ব্ব দুঃখ দূরে যায়, জীবের জীবন প্রাণের প্রাণ সেই রাধা-রমণের চরণে প্রাণ-মন সমর্পণ করাই জীবনের মুখ্যকর্ম্ম। যাঁহাকে পাইলে

মানব চিরপরিতৃপ্ত হয়, আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া যায়, বাসনার শেষ হইয়া যায়—যাহার পর আর লাভ নাই, যাহাপেক্ষা কামনার বিষয় আর কিছুই নাই সেই ধনের জন্য যার প্রাণ আকুল না হয় তাহাপেক্ষা হতভাগ্য জীব আর কে হইতে পারে? কিন্তু হায়! অধিকাংশই কুসুমাস্তৃত নিরয়-পথের যাত্রী, একটিও চক্ষুষ্মান্ বলিয়া বোধ হয় না। শাস্ত্র, গুরু, হিতার্থী, বন্ধু সকলে তারস্বরে বলিতেছেন, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া কুপথে ধাবিত হইও না। পথে প্রাণচ্ছেদী যাতনারাশি বিদ্যমান আছে, ফিরিয়া এস। কিন্তু সে উপদেশ কে শুনে? দুর্ভাগা জীব প্রবৃত্তির বশে মরু-মরীচিকায় পিপাসার্ত্ত কুরঙ্গবৎ জলপানাশায় ধাবিত হইয়া কাল-সাগরে বিলীন হইতেছে। কথিত হতভাগ্যজীবের নিস্তারার্থ করুণানিধি পরমেশ্বর ধরাধামে নরাকারে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। মায়াচ্ছন্ন জীব তাঁহাদিগকে চিনিতে পারেনা।

কিন্তু তবুও তিনি করুণাধারা বর্ষণে বিমুখ নহেন। তাঁহারই আদেশে সুনীল আকাশে রবি শশী গ্রহচয় পর্য্যায়ক্রমে উদিত হইতেছে, ছয় ঋতু পর্য্যায়ক্রমে গতায়াত করিতেছে, গন্ধবহ দিবানিশি বহিতেছে, অনল, সলিল জীবের হিতসাধনে রত আছে। যিনি অযাচিতভাবে জীবের প্রতি করুণা-ধারা বর্ষণ করিতেছেন, সেই পরমকারুণিকের অস্তিত্বে যাহারা সন্দেহ করে, তাহারা নিতান্তই ভাগ্যহীন। নশ্বর বিষয় বিভবের হিসাব ঠিক্ করিয়া লইয়া আমরা মনে করি আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ আর কেহই নাই। যাহারা ধর্ম্মার্থে বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিতে বলে, তাহারা প্রতারক পর-সুখাসহিষ্ণু। তাহাদের বাক্য অবিশ্বাস্য ও অশ্রদ্ধেয়। পরহিতেচ্ছায় সদুপদেশ দিলেও পামর দুরাত্মাদিগের ক্রোধের কারণ হয়।

পয়ঃ পানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনং।
উপদেশোহি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে॥

নীতিশাস্ত্রের এই উপদেশটি অতি মহান্। নিত্যানুভূত নশ্বর বস্তুই মানববুদ্ধি গ্রহণ করে, কিন্তু তাহারই অভ্যন্তরে যে সচ্চিদানন্দের সত্ত্বা বিদ্যমান আছে তাহার সন্ধান করে না।

অনেকে বলেন যে, নিরবচ্ছিন্ন বৈরাগ্য মত ভারতের বিপুল অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, বিজ্ঞানচর্চ্চা তিরোহিত হইয়াছে, মানবদল ঘোর অদৃষ্টবাদী হইয়া উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছে। অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান এক একটি এক এক মহাদেশের উন্নতি-সাধন করিয়াছে, ঐ উভয়ের কোন্‌টি

শ্রেষ্ঠ তাহার বিচার পণ্ডিতগণ করিবেন। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, আধ্যাত্ম বিজ্ঞানের মহিমায় ধ্বংসপ্রবণ জগতে হিন্দুজাতি আজ ও কাল জলধি-সলিলে বিলীন হইয়া যায় নাই। আর ২ কত জাতি কত ধর্ম্ম জগৎপৃষ্ঠে অভিনয় করিয়া চিরঅন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুজাতি অধঃপতিত হইয়াও ন্যগ্রোধ মহীরুহের ন্যায় উচ্চশীর্ষে সুদৃঢ় মূলে জগতীতলে বিরাজমান আছে। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের ইহাই যথেষ্ট শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। জড়বিজ্ঞান, ধনীর উদর পূরণ করিয়া দরিদ্রের হাহাকার বৃদ্ধি করিয়াছে। জড়বিজ্ঞান শান্তি নাশ করিয়া জগতে অশান্তি আনয়ন করিয়াছে। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সন্তপ্তপ্রাণে শান্তিধারা বর্ষণ করিয়াছে। একের পক্ষপাতী, স্মৃতি-চিহ্নের সহিত বিলুপ্ত হইবে, অপর যদি জন্মান্তর থাকে, তবে কিছু পুরস্কার অবশ্যই পাইবে। লাভালাভ খতাইয়া পাঠকবৃন্দ ভালমন্দ বিচার করুন।

ভারত ভাবপ্রবণ, পাশ্চাত্য, বিষয়া শক্তিপ্রবণ অন্তর বিজ্ঞানে ভারত শ্রেষ্ঠ, জড়বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যভূমি শ্রেষ্ঠ, ভারতীয় জনবৃন্দ শান্তির প্রয়াসী, পাশ্চাত্যেরা সমর প্রয়াসী। মানব মাত্রেই সুখ অন্বেষণ করে, শাস্ত্রকার মনীষীগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন বাহ্য বস্তুতে সুখ নাই, উহা দুঃখের উৎস মাত্র।

পণ্ডিতগণ বহু গবেষণা পূর্ব্বক সন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, সুখ দুঃখের অনুভব কর্ত্তা মনকে স্ববশে আনিতে পারিলেই মানব দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। মনকে বশে আনিবার জন্যই আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে। তবে উহাই জীবনের চরম লক্ষ্য নহে। অনিমাদি সিদ্ধিলাভ মানবজীবনের উদ্দেশ্য নহে। আমি, কে, এই সন্দেহে, খুঁজিতে ২ শেষ আত্ম সাক্ষাৎকার মানবজীবনের মুখ্য লক্ষ্য। কেননা, আনন্দই জীবের অভিপ্রেত, সেই আনন্দ অবিচ্ছিন্ন ধারায় ভোগ করা আত্মসাক্ষাৎকার ব্যতীত হইতে পারেনা। সুতরাং আত্ম-দর্শনই দুঃখনিবৃত্তি ও অবিচ্ছিন্ন সুখের হেতু। অবিচ্ছিন্ন সুখই জীবের অভিলষিত, সুতরাং জীবের তদভিমুখী হওয়াই স্বাভাবিক ভাব। ক্ষুদ্র তরঙ্গশীর্ষে প্রতিফলিত চন্দ্র কিরণবৎ দেহবিশিষ্ট চৈতন্য সেই দয়াল শ্রীহরির অংশভূত। সুখ শান্তিলাভ বাঞ্ছিত হইলে অবশ্যই সেই পরম দয়ালু শ্রীহরির চরণারবিন্দ নিঃস্যন্দ মকরন্দপানের জন্য ব্যাকুল হইতে হইবে। আকুল প্রাণে অকূলের কাণ্ডারি শ্রীহরিকে ডাকিলে তিনি কূলে তরি লয়ে এসে দুস্তর ভব-পারাবার পার করিয়া লইবেন। পারের কড়িও লাগিবে না।

তিনি অতুল করুণানিধি। তিনি পাপী তাপীর দুঃখমোচন জন্য সন্ন্যাসী-বেশে, দেশে দেশে গোলকের গুপ্তধন হরিনামামৃত সঞ্জীবনী ঔষধ সাধিয়া ২ গৃহে গৃহে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। মরি! মরি!! এমন দয়াল প্রভু আর কি হবে? আমরাও ধন্য, তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শে পবিত্র মহাতীর্থভূত ভূমিতে বাস করিতেছি। যিনি মরুভূমে প্রেমের বন্যা আনিয়াছেন, তাঁহার গুণ আমি দীন ভাষায় কেমনে বর্ণনা করিব? আমার মনে হয় আবার যেন তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লয়ে ভুবন মোহনরূপে বিশ্ব আলোকিত করিয়া পতিত পাপী-তাপীর উদ্ধার করিতে, মৃতসঞ্জীবনী হরিনাম বিতরিতে আসিবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

ফলিত জ্যোতিষ।

(৫)

কি ভাবে গ্রহগণের শুভাশুভত্ব বিচার করিতে হয়, তাহা ইতঃপূর্ব্বে কিছু কিছু দেখাইয়াছি। এইবার মৃত্যু ও আয়ুঃ বিচারের কথাও একটু বলিব। ইহা দ্বারা পাঠক দেখিবেন অভ্রান্তরূপে ভাগ্যফল গণনা করা কত কঠিন কার্য্য।

লগ্নের অষ্টমস্থানের নাম আয়ুঃস্থান। ঐ অষ্টমস্থানের অষ্টম অর্থাৎ লগ্নের তৃতীয় স্থানকেও আয়ুঃস্থান বলে। ঐ দুইস্থানের ব্যয়স্থান অর্থাৎ লগ্নের দ্বিতীয় ও সপ্তমস্থান মারকস্থান নামে অভিহিত হয়। শাস্ত্র বলিতেছেন—

"অষ্টমং হ্যায়ুষঃ স্থান মষ্টমাদষ্টমঞ্চ যৎ।
তয়োরপি ব্যয়স্থানং মারকস্থান মুচ্যতে।"

লগ্নের দ্বিতীয় ও সপ্তমস্থান পতি মারক হইলেও ঐ দুয়ের মধ্যে দ্বিতীয়াধিপই বলবত্তর মারক বলিয়া গণ্য হয়। কারণ—

"তত্রাপাদ্য ব্যয়স্থানাদ্দ্বিতীয়ং বলবত্তরম্।"

দ্বিতীয় পতি প্রবল মারকহেতু উহার দশাতেই মৃত্যু নিশ্চয় করিতে হয়। কোন কোন স্থলে মারকাধিপের সহিত সম্বন্ধযুক্ত দ্বিতীয় স্থানস্থিত ত্রিষড়ায়-পতির (তৃতীয়, ষষ্ঠ ও আয়পতির) দশাকালেও মরণ স্থির করা হইয়া

পরাশর বলেন—

"চন্দ্রভানু বিনাসর্ব্বে মারকা মারকাধিপাঃ।
ষষ্টাষ্টম ব্যয়ে শাস্তু রাহুঃ কেতুস্তথৈবচ।"

চন্দ্র ও রবি ভিন্ন অপর সকল মারকপতিই মারক হইতে পারে। ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশাধিপতি এবং রাহু কেতুও সময় সময় মারক হয়।

"তেষাং দশা বিপাকেষু সম্ভবে নিধনং নৃণাম্।
তেষামসম্ভবে সাক্ষাব্যয়াধীশ দশাস্বপি॥"

মারকস্থানাধিপতি বা মারকস্থানাধিপতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত ও মারকস্থানস্থিত ত্রিষড়ায় পতিগণের (তৃতীয়, ষষ্ঠ, একাদশ) দশা ও অন্তর্দ্দশাতেই মৃত্যু হইয়া থাকে। উক্ত গ্রহগণের দশায় মৃত্যু অসম্ভব হইলে লগ্নের দ্বাদশাধিপতির দশা ও অন্তর্দ্দশাতেই মৃত্যু হয়। ব্যয়াধিপতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত ত্রিষড়ায়পতির অন্তর্দ্দশাকালেও মৃত্যু হইতে পারে।

মৃত্যু বিচার করিবার পূর্ব্বে আয়ুঃ বিচার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কারণ জাতক অল্পায়ুঃ, মধ্যায়ুঃ বা দীর্ঘায়ুঃ তাহা পূর্ব্বে জ্ঞাত না হইলে মৃত্যুকাল নিশ্চয় হইতে পারেনা।

মনে করুন, কোন দীর্ঘায়ুঃ ব্যক্তির ৪০ বৎসরে মারকগ্রহের দশা ও অন্তর্দ্দশা পড়িল। ঐ সময় ঐ ব্যক্তির মৃত্যু না হইয়া পীড়াদি হইয়া থাকে। আবার কোন অল্পায়ুঃ ব্যক্তির ৩২ বৎসরের মধ্যে সাক্ষাৎ মারকগ্রহের দশা পড়িল না। এস্থলে মারকপতির সম্বন্ধী যে কোন পাপগ্রহের দশা ও অন্তর্দ্দশা ঐ ৩২ বৎসরের মধ্যে পড়িলেই ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইবে।

শাস্ত্রে অল্পায়ুঃ, মধ্যায়ুঃ ও দীর্ঘায়ুঃ এই তিনপ্রকার আয়ুর উল্লেখ আছে।

"ত্রিবিধাশ্চায়ুষাং যোগাঃ স্বল্পায়ুর্ম্মধ্যমোত্তমাঃ।
দ্বাত্রিংশাৎ পূর্ব্ব মল্পায়ুর্মধ্যমায়ুস্ততো ভবেৎ॥
চতুঃষষ্ট্যাঃ পুরস্তাত্তু ততো দীর্ঘমুদাহৃতম্।
উত্তমায়ু শতাদূর্দ্ধং জ্ঞাতব্যং মুনিসত্তম॥"

১ হইতে ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত অল্পায়ুঃ, ৩৩ হইতে ৬৪ পর্য্যন্ত মধ্যমায়ুঃ এবং ৬৫ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত দীর্ঘায়ুঃ। একশত বৎসরের ঊর্দ্ধকালকে উত্তমায়ু বলা যায়।

পরাশর সংহিতায় উক্ত আছে—

"চরে চরে স্থিতে দ্বৌ চ লগ্ন রন্ধ্রাধিপৌ যদি।
পূর্ণায়ুর্যোগ বিজ্ঞেয়ং নির্বিশঙ্কং দ্বিজোত্তম॥

স্থিরর্ক্ষে লগ্ন নাথো হি লয়েশো দ্বন্দ্বভে স্থিতঃ।
তদায়ঃ পূর্ণযোগশ্চ সম্ভবে গণিতাগ্রণি॥
তন্নাশীশে স্থিতে দ্বন্দ্বে স্থিরে স্থিতে লগ্নাধিপে।
পূর্ণায়ুর্যোগ বিজ্ঞেয়ং নির্বিশঙ্কং দ্বিজোত্তম॥
চরে লগ্নাধিপো বিপ্র স্থিরে রন্ধ্রপতির্যদা।
তদা মধ্যায়ুষং জ্ঞেয়ং দ্বৌ দ্বন্দ্বে মধ্যমায়ুষঃ॥
অঙ্গাধীশে চরে যস্য দ্বন্দ্বভে রন্ধ্রনায়কে।
তস্যাল্পায়ুর্মহাপ্রাজ্ঞ নির্বিশঙ্কং দ্বিজোত্তম।
স্থিরে স্থিরে স্থিতে দ্বৌ চ লগ্নরন্ধ্রাধিপৌ দ্বিজ।
স্বল্পায়ুস্তত্র বিজ্ঞেয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা প্রণোদিতম্॥"

লগ্নাধিপতি ও অষ্টমাধিপতি চর § রাশিতে থাকিলে অথবা লগ্নাধিপতি স্থির রাশিতে ও অষ্টমাধিপতি দ্ব্যাত্মকরাশিতে বা অষ্টমাধিপতি স্থিররাশি ও লগ্নাধিপতি দ্ব্যাত্মকরাশিতে থাকিলে জাতক দীর্ঘায়ুঃ হয়।

লগ্নাধিপতি চররাশিতে এবং অষ্টমাধিপতি স্থিররাশিতে অথবা অষ্টমাধিপতি চররাশিতে এবং লগ্নাধিপতি স্থিররাশিতে থাকিলে জাতক মধ্যায়ু হয়।

লগ্ন ও অষ্টমপতি উভয়ই দ্ব্যাত্মকরাশিতে থাকিলেও জাত ব্যক্তি মধ্যমায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

লগ্নাধিপতি ও অষ্টমাধিপতি এই দুয়ের মধ্যে একটি চররাশিতে ও অপরটি দ্ব্যাত্মকরাশিতে থাকিলে জাতক অল্পায়ুঃ হয়।

নিম্নে আরও কতকগুলি শাস্ত্রোক্ত আয়ুর্যোগ লিখিত হইল।

দীর্ঘায়ুঃ।

(১) অষ্টাধিপতি ষষ্ঠ বা ব্যয়স্থানে এবং দ্বাদশাধিপতি দ্বাদশ বা ষষ্ঠস্থানে অথবা ষষ্ঠ ও দ্বাদশাধিপতি লগ্ন বা লগ্নের অষ্টমস্থানে।

(২) শনি বা দশমাধিপতি স্বক্ষেত্র, মিত্রক্ষেত্র বা উচ্চস্থ হইলে।

(৩) লগ্নাধিপতি, অষ্টমাধিপতি, দশমাধিপতি এবং শনি, কেন্দ্র, ত্রিকোণ বা একাদশে থাকিলে।

(৪) লগ্নাধিপতি উচ্চস্থ, চন্দ্র একাদশস্থ এবং বৃহস্পতি অষ্টমস্থ হইলে।

§ মেষ—কর্কট—তুলা—মকর চররাশি; বৃষ—সিংহ—বৃশ্চিক—কুম্ভ স্থিররাশি এবং মিথুন—কন্যা—ধনু—মীন দ্ব্যাত্মকরাশি নামে কথিত হয়।

মধ্যমায়ুঃ।

(১) লগ্নাধিপতি দুর্ব্বল, বৃহস্পতি কেন্দ্র বা ত্রিকোণে এবং ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশস্থানে পাপগ্রহ।

(২) কেন্দ্র বা ত্রিকোণে শুভগ্রহ, শনি বলবান্ এবং ষষ্ঠ বা অষ্টমে পাপগ্রহ।

অল্পায়ুঃ।

(১) অষ্টমাধিপতি পাপযুক্ত ও লগ্নাধিপতি যুক্ত হইয়া দ্বাদশে।

(২) অষ্টমাধিপতি নীচস্থ, অষ্টমে পাপগ্রহ এবং লগ্নাধিপতি দুর্ব্বল।

(৩) পঞ্চমস্থানে পাপগ্রহ এবং অষ্টমাধিপতি পাপযুক্ত।

সাধারণতঃ দেখা যায় লগ্নাধিপতি মিত্রগৃহে থাকিলে দীর্ঘায়ু সমগৃহে থাকিলে মধ্যায়ুঃ এবং শত্রুগৃহে থাকিলে অল্পায়ু হইয়া থাকে।

শাস্ত্রোক্ত এই সকল আয়ুর্যোগের দ্বারা জাতক দীর্ঘায়ুঃ মধ্যায়ুঃ বা অল্পায়ুঃ তাহা প্রথমে স্থির করতঃ ঐ কাল মধ্যে যে সময় মারকপতির দশা বা মারকস্থানস্থিত বা মারকপতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত পাপগ্রহের অন্তর্দ্দশা-কাল উপস্থিত হইবে, সেই সময়ই মরণকাল নিশ্চয় করিতে হয়। উক্ত গ্রহগণের দশা ঐ সময়ের মধ্যে না পড়িলে দ্বাদশাধিপতির দশা অথবা দ্বাদশাধিপতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত পাপগ্রহের দশান্তর্দ্দশাকালে মৃত্যু স্থির করা হয়।

কোন অল্পায়ুঃ ব্যক্তির যদি ৩২ বৎসরের মধ্যে ঐ সকল মারকগ্রহের দশা না পড়ে তাহা হইলে কি হইবে? এই জন্যই পূর্ব্বশ্লোকে "তেষামসম্ভবে" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে।

মধ্যায়ুঃ ব্যক্তির আয়ুঃ ৬৪ বৎসর। ঐ সময়ের মধ্যে যদি পূর্ব্বোক্ত মারকপতির দশান্তর্দ্দশা বা মারকপতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত ত্রিষড়ায়পতির দশান্তর্দ্দশা বা ব্যয়াধিপতির অথবা তৎসহ সম্বন্ধকারী কোন পাপগ্রহের দশান্তর্দ্দশা না পড়ে তখন কি ভাবে মৃত্যু বিচার করিতে হইবে, তাহার উত্তরে শাস্ত্র আবার বলিতেছেন—

"অলাভে পুনরেতেষাং সম্বন্ধেন ব্যয়েশিতুঃ।
কচিচ্ছুভানাঞ্চ দশাস্বষ্টমেশ দশাসু চ॥"

তখন ব্যয়াধিপতির সম্বন্ধযুক্ত কোন শুভগ্রহের দশান্তর্দ্দশায় বা তদভাবে অষ্টমাধিপতির দশায় মৃত্যুকাল নিশ্চয় করিবে।

শনির মারকযোগ সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে।

"মারকৈঃ সহ সম্বন্ধান্নিহন্তা পাপকৃচ্ছনিঃ।
অতিক্রম্যেতরান্ সর্ব্বান্ ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥"

শনি যদি তৃতীয়, ষষ্ঠ বা একাদশপতি হইয়া মারকাধিপতির সহিত পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ সম্বন্ধের মধ্যে কোন একটি সম্বন্ধযুক্ত থাকে তাহা হইলে সকল মারকগ্রহকে অতিক্রম করিয়া শনি নিজেই প্রবল মারক হইয়া পড়ে।

শনি স্বয়ং মারকপতি হইলে সেস্থানে প্রবল মারকত্ব সম্বন্ধে আর কোনই সন্দেহ থাকেনা। যথা—মকর, ধনু ও সিংহলগ্নের শনি। শনিই সাক্ষাৎকাল-স্বরূপ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-বিশারদ।

ভক্তিতত্ত্ব।

"ভক্তি" কথাটি অতিগূঢ়ভাবের বোধক। ভক্তিমার্গই হিন্দুধর্ম্মমতে ভগবৎ-পদলাভের প্রকৃষ্ট পথ।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাচার্য্যেরাও ভক্তিতত্ত্ব নানাপ্রকারে বুঝাইয়াছেন। ভক্তবৃন্দের চরিতাবলী পাঠ করিয়াও ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এবং তাঁহার পারিষদবর্গের প্রেম-ভক্তিরসামৃত পরিপূরিত পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভক্ত চরিত্রের বিশেষত্ব ও ভক্তির মধুর কমনীয় ভাবাভাসের যৎ-কিঞ্চিৎমাত্র এই ক্ষুদ্র নীচ জীবনে উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই পাঠকগণের নিকটে উপহার দিব।

ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমে গীতোক্ত ভক্তিযোগ বিষয়ে আলোচনা করা আবশ্যক। প্রাধানতঃ গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম "ভক্তিযোগ।" কিন্তু দ্বিতীয় হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত সমস্ত অধ্যায়গুলি সম্যক্ পর্য্যালোচনা না করিলে গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্ব বুঝা যায় না। ইহাতে জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি তিনেরই সামঞ্জস্য আছে, এবং সেই সামঞ্জস্যের প্রকৃত অর্থ এই যে, তাহাদের চরম পরিণতি যাহা তাহাই ভক্তি। এই জন্য গীতাকে

প্রকৃতপক্ষে "ভক্তিশাস্ত্র" বলা যায়। গীতায় ভগবান্ প্রথমে অর্জ্জুনকে আধ্যাত্মিকতা অর্থাৎ আত্মার অবিনশ্বরতা বা সাংখ্যযোগ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। তৎপরে কর্ম্মযোগ বিশেষ বিস্তারিতভাবে বুঝাইতেছেন এবং ঐ কর্ম্মযোগেব প্রশংসা করিয়া অর্জ্জুনকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে বলিয়াছেন, কিন্তু সে কর্ম্ম বেদোক্ত কাম্য কর্ম্ম নহে। যাহা নিষ্কাম ধর্ম্ম তাহাই গীতার "কর্ম্মযোগ।" যথা—

"কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মাফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোহস্ত কর্ম্মণি॥"

অর্থাৎ "তোমার কর্ম্মেই অধিকার, কদাচ কর্ম্মফলে নয়। কর্ম্মের ফলার্থী হইও না; কর্ম্ম ত্যাগও করিও না।" অন্য স্থলে ভগবান্ কর্ম্মের সহিত ভক্তির সামঞ্জস্য রাখিয়া উপদেশ দিয়াছেন :—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্ম চেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমোভূত্বা যুদ্ধস্ব বিগতজ্বর॥"

অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ পূর্ব্বক নিষ্কামভাবে মমতা এবং বিকারশূন্য হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এই বিবেচনায় কর্ম্ম করিলে "কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ" করা হয়। ইহাতে এই বুঝায় যে, ভগবানের আদিষ্ট কর্ম্ম আচরণীয়। অর্থাৎ তিনি প্রভু, কর্ম্ম তাঁহার, আমি তাঁহার ভৃত্যরূপে কর্ম্ম করিতেছি। ইহার পরেই ভগবান্ "জ্ঞানযোগে"র কথা বলিয়াছেন :—

"বীতরাগ ভয় ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞান তপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥"

অর্থাৎ অনেকে বিগত রাগ ভয় ক্রোধ, মন্ময় (ঈশ্বরময়) ও আমার উপাশ্রিত হইয়া, জ্ঞান এবং তপস্যার দ্বারা পবিত্র হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়। গীতার ধর্ম্মের এই তাৎপর্য্য নহে যে, কেবল জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে তবে জ্ঞানযোগে পৌঁছান যায়। কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া পরমার্থ ভাবে সংশয় ছেদন কর। তখন এই শুদ্ধ জ্ঞানই ভক্তিতে যুক্ত হইবে। পরে ভগবান্ গীতায় যে সন্ন্যাসের কথা বলিয়াছেন, কর্ম্ম ত্যাগ বা সংসার ত্যাগ তাহার অর্থ নহে। তিনি বলিয়াছেন কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মত্যাগ উভয়ই মুক্তির কারণ, কিন্তু তন্মধ্যে কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ এইরূপে ক্রমান্বয়ে কর্ম্ম, জ্ঞান, সন্ন্যাস বিষয়ে

উপদেশ দিয়া ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যান যোগের শিক্ষা দিয়াছেন। এই যোগের অর্থ ১০০ শত বৎসর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শরীর ক্ষয় করা নহে। যে অবস্থায় চিত্ত উপরত হয়, বিশুদ্ধ ভাবে—আত্মাকে অবলোকন করিয়া তৃপ্ত হয়, যে অবস্থায় অত্যন্তিক সুখলাভ হয়, যে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে অন্য লাভকে তুচ্ছ জ্ঞান হয় এবং অসহ্য দুঃখ কষ্টও চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে না, সেই অবস্থাই প্রকৃত যোগের অবস্থা। কিন্তু ভগবান ভক্তকেই যোগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ৮ম অধ্যায়ে তারকব্রহ্ম যোগে একান্ত ভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৯ম অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না, তাহারা পাপযোনী হইলেও পরমাগতি লাভ করে। অতএব তুমিও এই অনিত্য ও সুখলেশ শূন্য মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হইয়া আমাকে ভজনা কর। তুমি সর্ব্বদা মদ্ভক্ত মন্মনা এবং মদ্‌যাজী হও; এবং এইরূপে মৎপরায়ণ হইয়া সমাহিত চিত্ত হইলেই আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে। দশম অধ্যায়ে ধনঞ্জয়কে তাঁহার অনন্ত বিভূতি যোগের বিষয় বর্ণন করিয়া একাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ তাঁহার সর্ব্বাশ্চর্য্যময় অনন্ত বিশ্বের যোনি স্বরূপ এবং কোটি সূর্য্যের প্রভাসম্পন্ন ঐশ্বরিক রূপ প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন। যাহা দর্শন করিয়া ধনঞ্জয় অত্যন্ত ভীত, বিস্ময়াবিষ্ট ও লোমাঞ্চিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে, প্রণত-শিরে প্রার্থনা করিলেন, হে বিশ্বমূর্ত্তে! জগন্নিবাস! তুমি তোমার এই রুদ্ররূপ সংবরণ করিয়া সেই বিশ্ববিমোহন সৌম্যরূপে প্রকাশিত হও। তখন শ্রীহরি প্রসন্ন হইয়া সৌম্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে বলিলেন তুমি আমায় যেরূপ দর্শন করিলে এইরূপ কেবল বেদাধ্যয়ন, ব্রত, দান বা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের দ্বারা দর্শন করিতে পারে না। কেবল—

"ভক্ত্যাত্বনন্যয়াশক্য অহমেবম্বিধোর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥
মৎকর্ম্ম কৃন্মৎপরমো মদ্‌ভক্তঃ সঙ্গ বর্জ্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! হে পরন্তপ! কেবলমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারা আমাকে দেখিতে পায় এবং সেই ভক্তি দ্বারাই আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে ও আমাতেই বিলীন হইতে পারে। হে পাণ্ডব! যিনি ঈশ্বরার্থেই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, যিনি কেবল ঈশ্বরেতেই আসক্ত, যিনি মৎপরায়ণ এবং সর্ব্বভূতে

নিষ্ঠের, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন। এই নিষ্কাম প্রেমই যথার্থ ভক্তি। ভক্ত প্রহ্লাদ এই অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে দুইটি ভক্তের কথা আছে। ধ্রুব ও প্রহ্লাদ। তন্মধ্যে ধ্রুবের উপাসনা সকাম। তিনি উচ্চপদলাভের জন্য বিষ্ণু উপাসনা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস এবং একাগ্রচিত্ততা থাকিলেও তাহা শ্রেষ্ঠ ভক্তের উপাসনা নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্যারিলাল দত্ত।

সংবাদ ও মন্তব্য।

সেণ্ট্রাল রিলিফ ফণ্ড। গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে সাইক্লোন রিলিফ ফণ্ডে ৩,১৫,৬১৯ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

শিল্প শিক্ষা। আগামী ১৮ই নবেম্বর অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় গবর্ণমেণ্ট হাউসে শিল্প-শিক্ষার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য এক সভা হইবে।

চাউলের দাম। ৩১শে অক্টোবর হইতে ৬ই নবেম্বর পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে চাউলের মূল্য শতকরা ৪'১৬ কম হইয়াছে।

কনভোকেসন। আগামী ২রা ও ৫ই জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিবিতরণ সভা হইবে। প্রথম দিন বাঙ্গলার গবর্ণর, দ্বিতীয় দিন গবর্ণর জেনারল সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

মেলা। বেহার গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে আগামী ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ২২শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পাটনায় এক প্রদর্শনী হইবে। সোনা-রূপার বহু মেডেল ও নগদ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

দান। লালগোলার রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর তাঁহার লালগোলার হাইস্কুল প্রায় ১২ বিঘা জমি, বাড়ী ঘর ও তাহা রক্ষার জন্য ৪৮১০০ টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। রাজা বাহাদুর শিক্ষার স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন।

যুগান্তর। বেঙ্গলী এই শুভসংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন যে রঙ্গপুরের প্রসিদ্ধ উকীল বাবু সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এই সর্ব্বপ্রথম পাবলিক সার্ব্বিস কমিশনের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। অতঃপর ব্যবহার জীবদের মধ্য হইতে আরও কেহ কেহ জেলার জজের পদে নিযুক্ত হইবেন। আমরা শুনিতেছি, ময়মনসিংহের ব্যারিস্টার মিঃ কে, এন, নাগও জেলার পদে নিযুক্ত হইতে পারেন।

ইঞ্জিনিয়ারদের বেতন। গবর্ণমেণ্ট এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, ইম্পিরিয়েল সার্ব্বিসের সিনিয়ার বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারগণ ৪র্থ বৎসরে ৭০০ টাকা ও ২৩ বৎসরে ১৬০০ এবং জুনিয়ার বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারগণ প্রথম বৎসরে ৪৫০ ও ১৫ বৎসরে ১১৫০ টাকা, প্রভিন্সিয়াল সার্ব্বিসের ইঞ্জিনিয়ারগণ সিনিয়ার বিভাগে ৪র্থ বৎসরে ৫০০ ও ২৩ বৎসরে ২৫০ এবং জুনিয়ার বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারগণ প্রথমবর্ষে ৩০০ ও ১৫ বৎসরে ৮৬০ টাকা বেতন পাইবেন। সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের বেতন ১৭৫০ টাকা হইতে ২১৫০ ও চিফ ইঞ্জিনিয়ারের বেতন ২৭৫০ হইতে ৩০০০ হইবে।